মাসুদ রানা

সবুজ সঙ্কেত

কাজী আনোয়ার হোসেন

Banglapdfboi.com

অহর

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

সবুজ সঙ্কেত

প্রথম প্রকাশ:২০০৪

এক

প্যারিসে কেউ যদি কিছুদিন কারও কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চায়, চার্লস দ্য গ্যল এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ঝাঁক বাঁধা হোটেলগুলো তার জন্য আদর্শ ঠিকানা হতে পারে। এসব হোটেলে সাধারণত কয়েক ঘণ্টা বা খুব বেশি হলে দু'একদিনের জন্য ট্র্যানজিট প্যাসেঞ্জার আর চার্টার এয়ারলাইনের ট্যুর গ্রুপগুলো ওঠে। ক্রিমিনাল বা পুলিশ, কারুরই এদের সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই। যারা আগ্রহী তারা এখানে মধুমাখা কোমল সেবা প্রদান করবার জন্য সারাক্ষণ এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী এইসব ফরাসী সুন্দরীরা পুরুষের মনোরঞ্জন করাটাকেই নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

নিউ মেইপ্‌ল্ হোটেলটা মোটেও নতুন নয়, ফিতে কেটে ব্যবসা শুরু করেছে আজ পঞ্চান্ন বছর হতে চলল। ছয়তলা ভবনটার চেহারায় যেমন আভিজাত্যের ছাপ আছে, কর্মচারীরা তেমনি বিনয়ী আর আতিথেয়তায়ও নিষ্ঠাবান।

বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। লবির কার্পেটে পানির দাগ। ভেজা জুতো পায়ে সেই দাগের উপর পা ফেললেন সুদর্শন এক ভদ্রলোক। বলিষ্ঠ গড়ন তাঁর, ব্যাকব্রাশ করা কুচকুচে কালো চুলে মুক্তো-দানার মত বৃষ্টির ফোঁটা লেগে রয়েছে। চোখ দুটো অস্থির, সতর্ক দৃষ্টি ফেলে লবির পরিবেশটা দ্রুত দেখে নিলেন।

ভেজা অফ-হোয়াইট ট্রেঞ্চ কোট খুলে হাতে ঝোলালেন রেদোয়ান আহমেদ, এলিভেটরে চড়ে পাঁচতলায় নিজের স্যুইটে চলে এলেন। হলওয়েতে আলো খুব কম, তা সত্ত্বেও দরজা ঠেলে স্যুইটে ঢুকবার সময় আধ ইঞ্চি লম্বা কালো সুতোটা পায়ের কাছে পড়তে দেখলেন। তিনিই এটা কবাটের ফাঁকে আটকে রেখে গিয়েছিলেন। সুতোটা যথাস্থানে থাকায় তাঁর আত্মবিশ্বাস কিছুটা দৃঢ় হলো। স্যুইটে ঢুকে সিটিংরুম হয়ে বেডরুমে চলে এলেন, হাতের কোট বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে ভেজা চুল শুকাবার জন্য বাথরুমের দিকে এগোলেন।

ওয়াশ বেসিনের দিকে চেয়েই স্থির হয়ে গেলেন তিনি। আয়নার ফ্রেমে ভাঁজ করা একটা কাগজ গোঁজা রয়েছে। আজ দুপুরে বেরুবার সময় এটা ছিল না। এই সুইটের চাবি আর মাত্র দুজনের কাছে আছে। একজন তো প্যারিসেই নেই, অপরজন ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিন্সের ইয়াকুব মালিক।

নোটটার ভাঁজ খুললেন তিনি। ছোট্ট মেসেজ। নীচে ইয়াকুব মালিকের নাম দেখে স্বস্তি বোধ করলেন।

'হঠাৎ করে ইরাকি ইন্টেলিজেন্স আবার যোগাযোগ করেছে। এবার মুশতাক সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। প্রথমে আপনি রু ভাউলায়ার গেট-এ

রাত এগারোটায় আমার সঙ্গে দেখা করুন। অবশ্যই একা আসবেন।—ইয়াকুব মালিক।'

মেসেজটা কোন ফাঁদ নয়, মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ইয়াকুব মালিকের হস্তাক্ষর তিনি পরিষ্কার চিনতে পারছেন। মেসেজটায় এমন জোরালো প্রতিশ্রুতি রয়েছে, অচলাবস্থা সম্ভবত কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে।

বাংলাদেশ দূতাবাসের সাবধানী সেকেন্ড সেক্রেটারি হাতঘড়ি দেখলেন। ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ডাইনিংরুমে বসে ডিনার সারার জন্য হাতে যথেষ্ট সময় আছে। চিরকুটটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে টয়লেটে ফেলে ফ্লাশ করলেন, চুল শুকাবার পর বেডরুমে ফিরে এসে রাইটিং ডেস্কে ভাঁজ খুললেন সিটি ম্যাপের। এটা হোটেল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করেছে। রু ভাউলায়ার সেইন নদীর বাম তীরে একটা রাস্তা। ছোটখাট একটা পার্ক-এর একদিকের সীমানা ওটা। জায়গাটা ঠিক কোথায়, ম্যাপে চোখ রেখে গেঁথে নিলেন মনে।

বেশ রাত হয়েছে, তাই বোর্ডারদের চেয়ে কলগার্লদের সংখ্যা বেশি দেখা গেল বার-এ। তাদের মধ্যে একটা মেয়ের চুল দেখে লেনার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। সুন্দরী বান্ধবীর অনুপস্থিতি বিষণ্ন করে তুলল তাঁকে। শহরের মাঝখানে নিরাপদ একটা ফ্ল্যাটে হপ্তাছয়েক খুব ভাল সময় কেটেছে তাঁদের। সম্পর্কটা যখন অচ্ছেদ্য হবার লক্ষণ প্রকাশ করছে, ঠিক এই সময় বিপদের গন্ধ পেয়ে ওর ভালর জন্যই লেনাকে দূরে এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটি চলে যাওয়ার এক হপ্তা পর তিনি উপলব্ধি করলেন, এত সাবধানে বাছাই করা ফ্ল্যাটটা আসলে মৃত্যুফাঁদে পরিণত হতে পারে। কাজেই তাঁকেও হঠাৎ করে সরে আসতে হয়েছে ওখান থেকে।

বরফ দেওয়া জিন ভাল লাগল না, গ্লাসটা শেষ না করেই ডাইনিংরুমে এসে বসলেন। অর্ডার অনুযায়ী ওয়েটার খাবার দিয়ে যেতে মনে হলো তাঁর খিদে নেই। নার্ভগুলো খুব উত্তেজিত হয়ে আছে, ভাবলেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে মাংসের প্লেটটা খালি করতে পারলেন। কফির কাপে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালেন, চোখ বুলাচ্ছেন দৈনিক লে মন্ডে-র পাতায়।

দশটায় টেবিল ছাড়লেন তিনি। ডাইনিংরুমে মাত্র দু'জন বৃদ্ধ বসে থাকলেন, বার-এ থাকল দুই তরুণ মাতাল। এদেরকে তাঁর সন্দেহের উর্ধ্বে বলেই মনে হলো। ধীর, অলস পায়ে লবিতে এসে রিসেপশন ডেস্কের সামনে থামলেন। মুখের কাছে হাত তুলে মিছিমিছি একটা হাই আড়াল করলেন। 'আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব,' ডেস্ক ক্লার্ককে বললেন। 'ফোন এলে অপারেটর যেন মেসেজ টুকে রাখে। আমি চাই না কেউ আমাকে বিরক্ত করুক।'

নিজের স্যুইটে ফিরে এলেন তিনি। বিছানা যেমন তৈরি করে রেখে গেছেন তেমনি আছে। গুছানো ব্যাগটা আগের মতই কাছাকাছি লাগেজ র‍্যাক-এ রয়েছে। কোন কিছুতে কারও হাত পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ট্রেঞ্চ কোটটা গায়ে চড়ালেন। দরজা খুলে উঁকি দিলেন হলওয়েতে। খালি। নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে

এসে করিডরের শেষ মাথায় চলে এলেন। করিডর আর ফায়ার এস্কেপ-এর মাঝখানে বাধা শুধু একটা জানালা।

বাইরের তাপমাত্রা আরও নেমেছে। এখন সম্ভবত ফ্রিজিং পয়েন্টের কাছাকাছি। লোহার কাঠামোয় বরফ জমেছে। ধাপগুলো পিচ্ছিল হয়ে আছে। অত্যন্ত সাবধানে, হ্যান্ডরেইল ধরে, ফায়ার এস্কেপ বেয়ে নেমে এলেন তিনি। তারপর সরু গলি পেরিয়ে বেরিয়ে এলেন মেইন রোডে।

আধ মাইলটাক হাঁটলেন তিনি। কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে না। বাস ধরে মাইল তিনেক এলেন, তারপর ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলেন সেইন নদীর বাম তীরের উদ্দেশে। নদীর ঘাটে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন, ফুটপাথ ধরে খানিক দূর হাঁটবার পর রাস্তা পেরিয়ে ঢুকলেন একটা কাফেতে। ব্র্যান্ডি মেশানো এক্সপ্রেসোর অর্ডার দিলেন। এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি থাকতে কফি শেষ করে বেরিয়ে এলেন কাফে থেকে।

রাস্তায় গাঢ় কুয়াশা। একটা ট্যাক্সি ডেকে ইয়াকুব মালিকের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলেন তিনি।

ড্রাইভার তাঁকে পার্ক ডুটাইন আর রু ভাউলায়ার-এর কোণে নামিয়ে দিল। কুয়াশার ভিতর দাঁড়িয়ে কান পাতলেন তিনি, চোখ বুলাচ্ছেন চারদিকে। ভেজা রাস্তায় ট্যাক্সির চাকা অদ্ভুত আওয়াজ করল। আওয়াজটা ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূরে। তারপর আর কিছু শোনা গেল না। রাস্তার বাম দিকে সারি সারি চার-পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। সেগুলোর সামনে বেশ কিছু ইউরোপিয়ান কার পার্ক করা। রাস্তার শেষ মাথায় কালো একটা সিডান দেখা যাচ্ছে, এত বড় যে বেন্টলি বা জাগুয়ার হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো কুয়াশা ভেদ করতে না পারায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রাস্তায় তাঁর দিকে একটা ছোট সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, এখানে গাড়ি পার্ক করা নিষেধ। ফুটপাথ একদম খালি। ফুটপাথের কিনারা থেকে সরু একটা পথ বেরিয়েছে, ফিতের মত বেড় দিয়ে রেখেছে একটা পার্ক বা কবরস্থানকে। একে অন্ধকার, তার ওপর কুয়াশা, খুব বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। ঘাস মোড়া জায়গাটা সারি সারি তিন ফুটী লোহার রড দিয়ে ঘেরা, রডের মাথাগুলো তিন ভাগ হয়ে তিনটে ফলায় পরিণত হয়েছে, প্রতিটি চোখা করা। রডের তৈরি বেড়ার মাঝখানে বন্ধ একটা গেট দেখা যাচ্ছে। ওটাই রু ভাউলায়ার গেট।

সাবধানে এগোলেন তিনি। কয়েক পা যেতেই অস্পষ্ট একটা মূর্তি দেখা গেল। এদিকে মুখ করে গেটের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। যথেষ্ট লম্বা-চওড়া, ইয়াকুব মালিক হতে পারে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা অলস, চেয়ে আছে আকাশের দিকে, গভীর চিন্তামগ্ন। কারও জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কেউ। গেটের দিকে আরও কয়েক পা এগোলেন তিনি। সন্দেহ হলো, কিছু একটা গোলমাল আছে। ছুটলেন। লোকটা তাঁর বন্ধু ইয়াকুব মালিকই। চোখ দুটো বিস্ফারিত। দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ। চেহারায় নগ্ন আতংক। সন্দেহ নেই মারা যাবার সময় ভয়ানক কষ্ট

পেয়েছে। তার টপ কোট বৃষ্টির ফোঁটা আর তাজা রক্তের স্রোতে ভিজে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে বুকের তিনটে গভীর গর্ত থেকে। একটা রডের তিনটে ফলা পিছন থেকে আমূল ঢুকে গেছে তাঁর পিঠে। মৃত্যুর কারণ অবশ্য সেটা নয়, বুকে গুলি করা হয়েছে তাঁকে।

একটা ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালেন তিনি। ওদিকে কয়েক গজ পর্যন্ত কুয়াশা সরে গেছে। বিরাট একটা কালো সিডানের হেডলাইট জ্বলে উঠল। আলোর বন্যায় অদৃশ্য হলো অন্ধকার। ফাঁদে আটকা পড়েছেন, বুঝতে পেরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে মরিয়া হয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন তিনি। বেড়াটা টপকে পার্ক বা কবরস্থানে ঢুকতে চেষ্টা করলেন, ফলায় ট্রেঞ্চ কোট আটকে যাওয়ায় সম্ভব হলো না, খসে পড়লেন বেড়ার গোড়ায়। প্রতিবাদমুখর টায়ার নিয়ে ছুটে আসছে বিরাট গাড়িটা। সিধে হলেন তিনি, আবার বেড়া টপকাতে যাচ্ছেন। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে একবার তাকালেন। হেডলাইটের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ দুটো। হিংস্র পশুর শক্তি খাটিয়ে ট্রেঞ্চ কোটের ফ্যাবরিক আর বোতাম ছিঁড়ে ফেললেন, গা থেকে খসাবার চেষ্টা করছেন। এই সময় গাড়ির ফেন্ডার আঘাত করল তাঁর কোমরে।

তীব্র ব্যথা পা বেয়ে নীচে নামল, বুকের হাড় বেয়ে উপরে উঠল। মাটিতে পড়লেন, অথচ ঝাঁকিটা প্রায় অনুভবই করলেন না। এক মুহূর্ত একটুও নড়লেন না। তারপর সিধে হবার চেষ্টা করলেন, জ্যাকেটের ভিতর হাত গলিয়ে শোল্ডার হোলস্টারের নাগাল পেতে চাইছেন। এই নড়াচড়া প্রচণ্ড ব্যথা ছড়াল, গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। মাথার ভিতর যেন একটা গুঞ্জন উঠছে। ভয় হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন, ফলে পিস্তলটা ধরবার জন্য আরেকবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হলো না, তার আগেই জ্ঞান হারালেন।

কালো সিডান দাঁড়িয়ে পড়েছে। নীচে নেমে ড্রাইভার তাঁর দিকে এগোল। ঝুঁকে দেখছে তাঁকে, গাড়ির ভিতর থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কী, মরে যায়নি তো?'

'জ্বী-না,' গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ড্রাইভার।

ব্যাক সিট থেকে নীচে নামল আরোহী, মুখের সরু চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে। দীর্ঘ কাঠামো, হাঁটবার ভঙ্গিতে প্রচণ্ড শক্তির আভাস পাওয়া যায়। দু'জন ধরাধরি করে সিডানের ব্যাকসিটে তুলে নিল বাংলাদেশ দূতাবাসের সুযোগ্য সেকেন্ড সেক্রেটারিকে।

কালো সিডান অকুস্থল ত্যাগ করছে, এই সময় গেটের উল্টোদিকের একটা বাড়ির সামনের আলো জ্বলে উঠল। দরজা খুলে প্রৌঢ় এক দম্পতি বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে হেডলাইট জ্বাললেন ভদ্রলোক। সামনের গেটের দিকে চোখ পড়তেই পাশে বসা স্ত্রী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার শুরু করলেন: 'খুন! খুন!'

দুই

হঠাৎ ইন্টারকম বেজে ওঠায় কাকলির বাড়িয়ে ধরা ট্রে থেকে কফির কাপটা তুলতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল রানা। রিসিভার কানে ঠেকাল। 'ইয়েস, রানা।'

'আমার চেম্বারে,' থমথমে ভারী কণ্ঠস্বর, বিসিআই চীফ রাহাত খান টেলিগ্রাফিক ভাষা ব্যবহার করছেন। 'ইমিডিয়েটলি।' তারপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

'মাসুদ ভাই, কফিটুকু খেয়েই না হয় যাও,' কথাটা বলে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেতে হলো কাকলিকে।

রানা তাকাল, কিন্তু দৃষ্টি দেখে মনে হলো না তাকে চেনে। সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে গেছে ও। অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল যেন একজন সম্মোহিত মানুষ।

সবগুলো ইন্দ্রিয় অতিমাত্রায় সজাগ, যে-কোন সঙ্কট সামাল দেওয়ার উপযোগী দৃঢ়তা চলে এসেছে দেহ ও মনে। সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল ছয়তলায়। করিডর ধরে হেঁটে এসে শেষ প্রান্তের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

ওকে দেখে ডেস্কের পিছন থেকে চেয়ার ছাড়ল বসের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা। নিঃশব্দ ইঙ্গিতে চেম্বারের দরজাটা দেখিয়ে দিল, যেন পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার জন্যই কোন বাক্য ব্যয় করছে না। রানাও আত্মপ্রত্যয় ধরে রেখে চেম্বারের দরজায় নক করল।

'কাম ইন।'

ভিতরে ঢুকে রানা দেখল খোলা একটা ফাইলে চোখ রেখে পাইপে তামাক ভরছেন বস্। এগিয়ে এসে হাতলওয়ালা একটা আর্ম-চেয়ারে বসল ও।

ফাইলটা ঘুরিয়ে উল্টো করলেন রাহাত খান, তারপর সেটা রানার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আগে এটা পড়ে নাও, বাকিটা বলছি তারপর।'

ফাইলটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করল রানা। এটা একটা রিপোর্টই, তবে গল্পের আদলে লেখা হয়েছে। পটভূমি প্যারিস। এ গল্পের নায়ক বা মূল চরিত্র দুটো। একজন পঁচাত্তর বছর বয়সী ইরাকি বিজ্ঞানী, নাম ডক্টর দানিশ মুবারক। অপরজন একজন বাঙালী, প্যারিসের বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি। গল্পে তাঁর আসল নাম নয়, ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে–তিনি নিজেও এই নামে কাজ চালিয়েছেন। গল্পটা বড় হওয়ায় পড়তে রানার বেশ সময় লাগল। সংক্ষেপ করলে সেটা এরকম দাঁড়ায়:

মুখাবারাত এল-আম বা ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট ইয়াকুব মালিক আর বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি রেদোয়ান আহমেদ

পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশ-বাইশ দিন আগে ইয়াকুব একটা দামী রেস্তোরাঁয় বন্ধু রেদোয়ানকে ডিনারে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ডক্টর দানিশ মুবারক সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কি না।

দেখা গেল বয়োবৃদ্ধ এই ইরাকি বিজ্ঞানী সম্পর্কে রেদোয়ান অনেক খবরই রাখেন।

গত মাসে পঁচাত্তরে পা দিয়েছেন ডক্টর দানিশ মুবারক। তিনি একজন ইলেক্ট্রোকেমিস্ট। নব্বুইয়ের দশকে পর পর দু'বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয় তাঁকে, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ডক্টর মুবারককে প্রকাশ্যে কেউ বাগদাদে দেখেনি। গুজব রটেছে, তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। তবে কেউ কেউ বলে, ডক্টর মুবারক আসলে গত তিন বছর ধরে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত একটা বিষয়ে গোপন গবেষণা চালাচ্ছেন।

কণ্ঠস্বরে বিষাদ ঝরিয়ে ইয়াকুব জানালেন: মার্কিন দখল-দারদের ভয়ে ডক্টর দানিশ মুবারক বাগদাদে লুকিয়ে আছেন। তিনি এবং তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা ভয় পাচ্ছেন, আমেরিকানরা তাঁকে ধরতে পারলে বন্দি করবে, তারপর ব্ল্যাকমেইল বা টরচারের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের ফর্মুলা আদায় করে নেবে–এবং বলাই বাহুল্য যে তার মধ্যে অবশ্যই 'মুবারক ফর্মুলা'-ও থাকবে।

এই 'মুবারক ফর্মুলা' কী, ইয়াকুব মালিক বা তাঁর বসের কোন ধারণা নেই। যাই হোক, মার্কিনিরা বৃত্তটা ছোট করে আনছে, বুঝতে পেরে বিশেষ দূত-এর মাধ্যমে মিশর সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন ডক্টর মুবারক। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও জানিয়েছেন যে ইরাক বেদখল হয়ে গেলেও আল মুখারাবাত বা ইরাকি ইন্টেলিজেন্সের দেশপ্রেমিক এজেন্টরা বিভিন্ন দেশে এখনও তাদের নেটওঅর্ক ঠিকঠাক রাখবার চেষ্টা করছে, এবং তারা তাঁকে নিরাপদে প্যারিসে পৌঁছতে কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। কোন কারণে কায়রো যদি তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে সমর্থ না হয়, প্যারিস থেকে ডক্টর মুবারক এমন একটা মুসলিম প্রধান দেশে যেতে চান, যে-দেশ তাঁকে লুকিয়ে রাখতে পারবে, আর যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবার সব রকম সুযোগ-সুবিধে পাবেন তিনি।

দুঃখের বিষয় হলো, সব শুনবার পর কায়রো জানিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে ডক্টর মুবারককে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য যে বুশ প্রশাসনকে ভয় পাচ্ছে কায়রো। এরকম পরিস্থিতিতে, ইয়াকুব মালিক জানতে চাইলেন, বাংলাদেশ সরকার কি ডক্টর দানিশ মুবারক সম্পর্কে কোন রকম আগ্রহ দেখাবে বলে মনে হয়?

উত্তরে রেদোয়ান আহমেদ বললেন, আজ রাতেই দূতাবাস-প্রধানের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করবেন, তিনি কী বলেন সেটা কাল সকালে ইয়াকুবকে জানাবেন।

সব কথা শুনে দূতাবাস-প্রধান ব্যাপারটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন। কালবিলম্ব না করে সেই রাতেই বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা জানালেন। একই সঙ্গে রেদোয়ান আহমেদকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন তাঁর আত্মীয়ের মাধ্যমে গোটা ব্যাপারটা জানান বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে। রেদোয়ান আহমেদের এক নিকটাত্মীয় যে বিসিআই-তে চাকরি করেন, দূতাবাস-প্রধান সেটা জানতেন।

এরপর সব কিছু খুব সংগোপনে ও দ্রুত ঘটতে শুরু করল। সরকারী নীতি-নির্ধারকরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর বিসিআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ইমার্জেন্সী মীটিং করলেন। মীটিঙে প্রথমে বাস্তব পরিস্থিতি স্মরণ করা হলো: বাংলাদেশ প্রতিপক্ষের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল এক দেশ। অসুরদের বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়াটা আমাদের সাজে না। মিশর যখন ডক্টর দানিশ মুবারককে আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি, তখন বাংলাদেশ সাহস পায় কী করে।

তবে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা মানবিক দিকও তো আছে। গায়ের জোরে যেমন ইরাক-দখল মেনে নেয়া যায়নি, তেমনি ইরাকি জনগণের উপর অন্যায় আত্যাচারও মেনে নিতে বিবেকে বাধছে সবার। বৃদ্ধ একজন বিজ্ঞানী নিজের প্রাণ আর আবিষ্কার রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তাঁর সত্যিই সাহায্য দরকার। আমরা কি তাঁকে সাহায্য করব?

এরপর গোটা ব্যাপারটা ঘুরেফিরে বিসিআই-এর উপরেই চেপে বসল। তারা কী বলে শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক। তারা কি ডক্টর মুবারককে গোপনে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারবে? এতটাই গোপনে যে কাকপক্ষীও টের পাবে না? এই গোপনীয়তা রক্ষা করবার উপর নির্ভর করবে আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা. কাজেই এটাকে হালকাভাবে দেখবার কোন উপায় নেই।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর বিসিআই-এর কর্ণধার মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান উত্তর দিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা পারব।

ব্যস, সরকার আর সবুজ সংকেত দিতে দেরি করেনি।

ইতোমধ্যে জানা গেছে, মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ইয়াকুব মালিক একা শুধু রেদোয়ান আহমেদের মাধ্যমেই সহযোগিতা করতে চান, তৃতীয় কাউকে নিজের পরিচয় বা তৎপরতা সম্পর্কে জানাতে চান না।

ফাইলটা পড়া শেষ করে মুখ তুলে বসের দিকে তাকাল রানা। 'এরপর কী ঘটল, সার?'

'আমরা খবর পেলাম ঈজিপশিয়ান এজেন্ট ইয়াকুব মালিক খুন হয়েছেন,' বললেন, বস্। 'আর সেই থেকে রেদোয়ান আহমেদও নিখোঁজ।'

'আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল?'

'প্রথম তিন হপ্তা ছিল। বেশ মোটা অঙ্কের টাকাও পাঠানো হয়েছে। তবে কাজ কতদূর এগোল, সে সম্পর্কে তিনি কোন রিপোর্ট পাঠাননি।'

'এখন তাহলে...

'এখন সব দায়িত্ব আমাদের,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'ওখানে, প্যারিসে যাবে তুমি। অসমাপ্ত অপারেশনটা শেষ করবে। আগে রেদোয়ানকে খুঁজে বের করতে হবে, তা নয়। তোমার ফার্স্ট-প্রায়োরিটি ডক্টর দানিশ মুবারককে বাংলাদেশে নিয়ে আসা। নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা রক্ষা করে।'

ডেস্কের দেরাজ খুলে একটা এনভেলাপ বের করে রানার দিকে ঠেলে দিলেন বিসিআই চীফ। 'রেদোয়ান আহমেদ।'

এনভেলাপ থেকে ফটোটা বের করল রানা। দেখল রেদোয়ান আহমেদ শুধু সুদর্শনই নন, মূল্যবান পরিচ্ছদে নিজেকে সাজিয়ে রাখতেও বিশেষ পছন্দ করেন।

'তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে?'

রানা যেন অথৈ সাগরে পড়ে গেছে। 'সার, যদি একটু বলে দিতেন কোত্থেকে শুরু করব। কিংবা ওখানে কারও সাহায্য পাব কিনা...'

'কোত্থেকে শুরু করবে, এখানে বসে আমি বলব কী করে?' প্রায় চাবুকের আঘাত মনে হলো বসের কণ্ঠস্বর। 'ফিল্ডে নামো। নেমে দেখো, নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে তুমি, প্রয়োজনে সাহায্য চাইবে আমাদের।'

'জ্বী, সার।' ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ছে রানা।

'কাগজ-পত্র আর পাসপোর্ট ইলোরার কাছে পাবে,' আবার বললেন রাহাত খান। 'আর, হ্যাঁ, প্যারিসের ওরলি এয়ারপোর্টে তোমাকে নিতে আসবে শাকিল মাহমুদ–সিক্রেট সার্ভিস অভ ঈজিপ্ট-এর এজেন্ট, ইয়াকুব মালিকের সহকারী। তবে তোমাকে সে কতটুকু কী সাহায্য করতে পারবে আমি জানি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে বসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা।

মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের জুনিয়র এজেন্ট শাকিল মাহমুদ দীর্ঘদেহী সুদর্শন তরুণ, চলনে-বলনে একটু যেন বেশি সপ্রতিভ। দেখা গেল ফরাসী ইমিগ্রেশন আর কাস্টমস্ অফিসারদের সঙ্গে তার ভালই দহরম-মহরম, হাস্য-কৌতুক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি রানাকে চেকিং-এর ঝামেলা থেকে মুক্ত করে আনল।

ইতিমধ্যে পরিচয় আর কুশল বিনিময় হয়ে গেছে। রেদোয়ান আহমেদের কোন খোঁজ কি পাওয়া গেছে? রানার এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়েছে মাহমুদ।

ইঙ্গিতে রানাকে ব্রিফকেসটা কাউন্টার থেকে তুলে নিতে বলল সে। অ্যারাইভাল লাউঞ্জ হয়ে মূল টার্মিনাল ভবনে বেরুচ্ছে ওরা। মাহমুদ জানাল, তার ড্রাইভার মিশরীয় দূতাবাসের একটা সিডান নিয়ে টার্মিনাল ভবনের সামনে অপেক্ষা করছে।

রানা জানতে চাইল, 'আপনি ঠিক কিভাবে আমাকে সাহায্য করতে চান, জানাতে পারলে ভাল হত।'

মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স-এর জুনিয়র এজেন্ট মাহমুদ ইতস্তত করছে।

রানা বলল, 'আমি গাড়িতে বসে আলাপ করতে চাইছি না।'

রানার দিকে এক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটু হাসল মাহমুদ। সতর্ক একজন এজেন্ট! 'আমার ইমিডিয়েট বস্, মিস্টার ইয়াকুব মালিক আমাকে বলেছিলেন, তিনি আর মিস্টার রেদোয়ান অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা কাজে হাত দিয়েছেন। যে-কোন একজন, কিংবা দু'জনই তাঁরা খুন হয়ে যেতে পারেন।

'বসকে আমি জিজ্ঞেস করি, কাজটা কী। তিনি বললেন, "কাজটা কী তা না জানাই তোমার জন্যে ভাল।"'

রানা দাঁড়িয়ে পড়েছে, ফলে তাকেও দাঁড়াতে হলো। 'তারপর বস্ বললেন, "আমি আর মিস্টার রেদোয়ান, দু'জনেই যদি মারা যাই, তাহলে এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চয়ই ঢাকা থেকে কাউকে পাঠানো হবে।" বললেন, আমার কাজ হবে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই ভদ্রলোক কবে আসবেন জেনে নেয়া।'

'বেশ। জেনেছেন,' বলল রানা। 'সেই ভদ্রলোক আপনার সামনে দাঁড়ানো। এখন বলুন, মিস্টার ইয়াকুব মালিক কী মেসেজ রেখে গেছেন।'

'বলব কি না ঠিক বুঝতে পারছি না।' মাথা চুলকাল মাহমুদ।

'মানে?'

'বস্ একটা সংকেত বা কোড সত্যি আমাকে দিয়ে গেছেন,' বলল মাহমুদ, 'কিন্তু তাঁর নির্দেশ ছিল, তিনি এবং মিস্টার রেদোয়ান আহমেদ খুন হলে তবেই সেটা আপনাকে জানাতে হবে। কিন্তু মিস্টার আহমেদ খুন হয়েছেন কিনা তা তো আমরা জানি না।'

'না, জানি না,' বলল রানা। 'তবে আপনার বস্ সম্ভবত তাঁর অনুপস্থিতির কথাও বোঝাতে চেয়েছিলেন। একজন মারা গেছেন, আরেকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই কোডটা আপনি আমাকে জানাতে পারেন।'

'ঠিক আছে, চলুন তাহলে প্রথমে মিস্টার রেদোয়ান আহমেদের ফ্ল্যাটেই যাই।'

'কেন, ওখানে কেন?'

'কোডটা আমি ওখানে রেখেছি,' বলল জুনিয়র এজেন্ট। 'দিনের বেশিরভাগ সময় ওখানেই থাকতে হয় আমাকে। রেদোয়ান আহমেদ ফিরে আসবেন, এই অপেক্ষায়।'

'বেশ, চলুন,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। মাহমুদকে পাশে নিয়ে আবার হাঁটা ধরল বটে, তবে দরজার দিকে যাচ্ছে না। ওর ইচ্ছে টার্মিনাল ভবনের ভিতর থেকে গাড়িটাকে একবার দেখে নেয়া। কাঁচ-মোড়া চওড়া জানালার সামনে দাঁড়াতে মিশরীয় পতাকাবাহী লম্বা সিডানটা অনায়াসেই চিনতে পারল ও।

গাড়িটা রয়েছে 'নো পার্কিং' লেখা একটা সাইনবোর্ডের নীচে। একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ, হাতে নাইটস্টিক, অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গল্প করছে

ড্রাইভারের সঙ্গে। রানা ভাবল, সব দেশের পুলিশই ঘুষ খায়। মাহমুদের দিকে তাকাল ও। 'এটা আপনার গাড়ি?'

মাথা ঝাঁকাল মাহমুদ। 'জ্বী। আমাদের দূতাবাসের গাড়ি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আপনি আমাকে ওই গাড়ি করে নিয়ে যেতে চান?' জানতে চাইল রানা।

মাহমুদ যেন ঠিক এরকম একটা প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল। এক গাল হাসল সে। মাথা নাড়ল। 'প্যারিসে যত স্পাই আছে সবাই ওটার ওপর নজর রাখুক। আপনাকে আমি অন্য একটা গাড়িতে তুলে নেব।'

রানার চোখে নীরব প্রশংসা।

'আপনি এদিকের সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়ে এগজিট রোডে পৌঁছাবেন, রুট সিক্সে যেটা মিলেছে।' হাতঘড়ি দেখল মিশরীয় এজেন্ট। 'এখন থেকে ঠিক দশ মিনিট পর আপনাকে আমি একটা সাদা হোন্ডায় তুলে নেব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা পে টয়লেটে ঢুকল রানা। কিউবিকলে ঢুকে জ্যাকেট খুলল, সেটা ঝুলিয়ে রাখল বন্ধ দরজার পিঠে। ব্রিফকেসের গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে বেরুল প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার, নরম হোলস্টার সহ। হোলস্টারটা এমনভাবে তৈরি, পিস্তলটা থাকবে ঠিক বাঁ বগলের নীচে। একই কমপার্টমেন্ট থেকে ছুরিটাও বেরুল, জায়গা পেল ডান কনুইয়ের উল্টোদিকে, খানিকটা নীচে। ওটার ফলা চার ইঞ্চি লম্বা। রানার হিসাবে চার ইঞ্চিই যথেষ্ট; বিশেষ করে হার্ট আর জাগিউলার ভেইন, দুটোকেই যখন মানুষের শরীরের তিন ইঞ্চিরও কম গভীরে পাওয়া যায়।

ঠিক দশ মিনিট পর অত্যন্ত কৌশলে আর সুষ্ঠুভাবে রানাকে সাদা একটা হোন্ডায় তুলে নিল মাহমুদ। পাশে চলে এসে স্পীড কমাবার সময় প্যাসেঞ্জার ডোর একটু ফাঁক করে রাখল সে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। হাতের ব্রিফকেস ছুঁড়ে সামনের সিটে ফেলল ও, তারপর সেটার পিছু নিয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নিজেও উঠে পড়ল। যানবাহনের মিছিল দু'সেকেন্ডের জন্য থমকেছে কী থমকায়নি।

'ওয়েল ডান,' প্রশংসা করল রানা।

মাহমুদ একবার শুধু তাকাল। রুট এ-সিক্স ধরে ফুল স্পীডে সিডান ছোটাল সে। চোখ সামনের রাস্তায়; চোয়াল শক্ত।

'রেদোয়ান আহমেদ। কী জানেন আপনি তাঁর সম্পর্কে?'

'তাঁকে আসলে আমি কখনও দেখিনি,' বলল মাহমুদ। 'আমার বস্ মিস্টার মালিকই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন আমাকে।'

'কী বলেছিলেন সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলুন, ইয়াকুব মালিক খুন হলেন কেন।'

'পুলিশ লাশের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে বলছে, হয় তথ্য আদায়ের জন্যে কেউ তাঁকে নির্যাতন করেছে, নয়তো ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটিয়েছে। যাই ঘটে থাকুক, লাশটা অন্য কোথাও থেকে এনে লোহার গেটের গায়ে ঝোলানো

হয়েছিল।'

'আপনার বস রেদোয়ান আহমেদ সম্পর্কে কী বলেছিলেন আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাঁর ঠিকানা দিয়ে হঠাৎ একদিন বললেন–ইনি বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকরি করেন, রেদোয়ান আহেমেদ, আমার বিশেষ বন্ধু। ভদ্রলোককে না জানিয়ে তাঁর ফ্ল্যাটটা সার্চ করে এসো। আমি ভাবলাম, তবে কি বন্ধুকে উনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না? জিজ্ঞেস করতে বললেন–তা নয়, জানা দরকার শত্রুরা কেউ তাঁর ফ্ল্যাটে কিছু রোপণ করল কিনা।'

'কিছু পেয়েছিলেন?'

'সার্চ করে? নাহ্। শুধু জানতে পেরেছি ভদ্রলোকের গার্লফ্রেন্ড হাউসকিপার হিসেবে একদম অচল।'

'এটা কবেকার কথা?'

'কাল থেকে ঠিক দু'হপ্তা আগে।'

হিসাবটা মেলে। বস্ বলেছেন, রেদোয়ান আহমেদকে বিসিআই প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠায় হপ্তা তিনেক আগে। 'গার্ল ফ্রেন্ডের কথা বললেন। ওঁরা কি লিভ-টুগেদার করছিলেন?'

'ঠিক জানি না। তবে শুনেছি প্যারিসের বহু সুন্দরীই তাঁর জন্যে পাগল। সেজন্যে দায়ী নাকি তাঁর ফিগার আর চেহারা।'

চোখের পলকে একটা রোডসাইন পিছিয়ে পড়ল। প্যারিসের মধ্যবিন্দু চার কিলোমিটার সামনে। ব্রিফকেসটা ব্যাকসিটে রাখবার ছুতোয় পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা।

তিনটে লেনেই ঝাঁক ঝাঁক গাড়ি। দুটো লেনের ড্রাইভাররা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। ওদের সরাসরি পিছনে রয়েছে কালো একটা সিত্রোঁ।

ঘুরে সামনের দিকে মুখ করে বসল রানা। রিয়ার-ভিউ মিরর অ্যাডজাস্ট করে নিল, ফলে পিছু নেওয়া গাড়িটার উপর নজর রাখতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আরও সিকি মাইল পর স্পীড বাড়িয়ে ওদেরকে ওভারটেক করল গাড়িটা। ভিতরের লোকজন ডানে-বাঁয়ে কোনদিকেই তাকাচ্ছে না। লোকগুলো সম্ভবত ব্যবসায়ী; হয় বোবা, না হয় পরস্পরের প্রতি এতই বিরক্ত যে কেউ কোন কথা বলবার গরজ অনুভব করছে না। দুটো গাড়ির মাঝখানে অন্যান্য গাড়ি ঢুকে পড়ল, ফলে এক সময় হারিয়ে গেল সিডান। আরও প্রায় মাইল দুয়েক এগোবার পর একই রঙের আরেকটা গাড়িকে হাইওয়ের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। ভিতরটা মনে হলো খালি। এমন হতে পারে ওটা হয়তো কয়েক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। নিজের চিন্তা-ভাবনার ভাগ মাহমুদকে রানা দিচ্ছে না। অল্প সময়ের ভিতর কয়েকটা টাইম জোন পেরিয়ে আসায় ক্লান্ত ও; অতি মাত্রায় সতর্কতার জন্য এই জেট ল্যাগ-ও দায়ী হতে পারে। কাজেই মাহমুদকে উদ্বিগ্ন করে তুলবার কোন মানে হয় না।

গাড়ি মনট্রফ টার্নঅফ-এ পৌঁছাল।

বাঁক ঘুরবার জন্য র‍্যাম্পে উঠছে মাহমুদ, ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। দৃষ্টিপথে মস্ত একটা বাধা হয়ে ওদের রুট অনুসরণ করছে বিরাট একটা ট্র্যাক্টর-ট্রেইলার। কোন কার যদি পিছু নিয়ে থাকে, লুকিয়ে থাকবার ভাল সুযোগ পাচ্ছে ড্রাইভার।

বুলেভার্ড রাসপাইল-এ পৌঁছে সামনে একটা ন'নম্বর বাস পেল মাহমুদ, সেটার পিছু নিয়ে বুলেভার্ড দ্য মন্টপারনাসে পর্যন্ত এল। ইন্টারসেকশনে বালজাক-এর বিখ্যাত স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে থাকলেও, পিছনে আটান্নতলা কংক্রিট টাওয়ার তৈরি হওয়ায় ওটার সৌন্দর্য অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। হুইল ঘুরিয়ে দ্রুত ডানদিকে বাঁক নিল মাহমুদ। মন্টপারনাসের বোহেমিয়ান বৈশিষ্ট্য আজও চোখে পড়ে। শতাব্দীর শুরুতে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী আর তাবৎ বিপ্লবী রাজনীতিকদের স্বর্গ হয়ে উঠেছিল জায়গাটা। সেই থেকে এখানকার খুব কম জিনিসই বদলেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা আজও এখানে আড্ডা দিতে ভিড় করে। অনেকেই এলাকার ছোটখাট হোটেলে থাকে। পুরানো বইয়ের দোকানগুলোয় আগের মতই উপচে পড়া ক্রেতা। ফুটপাথে ফেলা টেবিলে বসে তরুণ-তরুণীরা দেরি করে ব্রেকফাস্ট সারছে। প্যারিসে সিরিয়াস আর্টিস্ট আর আর্ট স্টুডেন্ট রয়েছে পঞ্চাশ হাজার, তার অন্তত অর্ধেকই বাস করে মন্টপারনাসেতে। চওড়া বুলেভার্ডের কিনারায় সারি সারি আর্ট শপ আর গ্যালারি দেখা যাচ্ছে। সাইড স্ট্রীটগুলো সরু, গিরিখাদের মত। পুরানো বহুতল ভবনগুলো দুপুর বাদে অন্য কোনসময় এক চিলতে রোদও ঢুকতে দেয় না। এরকম একটা ভবনের সামনে গাড়ি থামাল মাহমুদ। হোন্ডা ঘুরিয়ে নিয়ে একটু পিছিয়ে এসেছে সে, রু নটরডেম দ্য চ্যাম্পস থেকে চলে এসেছে রু ল্যাভেরিয়ার-এ। দরজার পাশে মরচে ধরা ধাতব পাতে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের নম্বর লেখা রয়েছে–২৮৭।

'এই বাড়িটা,' বলল সে।

গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাথে দাঁড়াল রানা। ছয়তলা ভবনটা সরু লাগছে। প্রবেশপথটা বেকারি শপ আর শূ স্টোর-এর মাঝখানে। দরজার ভিতরে টাইল বসানো লবি। লবির শেষ মাথায় এলিভেটর, বড়সড় একটা পাখির খাঁচা বলে মনে হলো। শাফটটা প্লাস্টার ওঠা দেয়াল দিয়ে ঘেরা, ভিতরে জায়গা করে নিয়েছে এক প্রস্থ সিঁড়ি–উপরতলায় পৌঁছানোর বিকল্প একটা ব্যবস্থা। মাহমুদের পিছু নিয়ে ছোট্ট ক্যাব-এ ঢুকল রানা। দু'জন দাঁড়ানোর পর আর খুব একটা জায়গা নেই। একটা প্ল্যাকার্ড-এ পাঁচটা সিলেক্টর বাটন রয়েছে, মাহমুদ উপরেরটায় চাপ দিল। ক্যাব-এর ছাদে একটা গিয়ার হুইল ঘুরতে শুরু করল। ঝাঁকি খেল কেবল্, পাখির খাঁচা উপরে উঠছে। ওরা বরং সিঁড়ি ভাঙলে আগে পৌঁছাতে পারত।

তিনতলায় উঠে এসেছে, এই সময় একটা টেলিফোন বেজে উঠল।

'এটা ওঁর!' চারতলা পেরোবার সময় বেলটা আবার শুনতে পেয়ে সবিস্ময়ে

বলল মাহমুদ। পাঁচতলায় উঠে এলিভেটর ছেড়ে বেরুচ্ছে, তখনও বাজছে টেলিফোন।

মাহমুদের কাছে চাবি আছে। কী হোলে চাবি ঢুকিয়েছে, আবার বেজে উঠল বেলটা। দরজা খুলে ছুটে গেল সে, রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'ধুত্তোর!' হতাশ ভঙ্গি করে রানার দিকে তাকাল। 'ওরা রেখে দিয়েছে!'

ফ্ল্যাটের ভিতর গুমোট একটা ভাব। হেঁটে এসে বন্ধ জানালার সামনে দাঁড়াল রানা, পর্দা সরিয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে রাস্তার উপর চোখ বুলাল। রু ল্যাভেরিয়ারকে দেখে সকল অর্থেই শান্ত আর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দীর্ঘ এক মিনিট চোখ বুলাতে হলো ওকে। এরপর জানালার শার্শি খুলে তাজা বাতাস ঢুকবার ব্যবস্থা করল।

ঘরের এক কোণে এক গাদা কাগজ-পত্র জমে আছে, তার ভিতরে হাত ডুবিয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সাদা একটা এনভেলাপ বের করল মাহমুদ। তার বাড়ানো হাত থেকে নিয়ে এনভেলাপটা ছিঁড়ল রানা।

ভিতরে একটা মাত্র বাক্য লেখা, ইংরেজিতে। বাংলা করলে এরকম অর্থ হয়: 'যদি দেখেন আপনাকে কেউ চিনতে চাইছে না বা বিশ্বাস করতে পারছে না, তাকে বলুন "আমি ওমর খৈয়মের ভক্ত"।'

'ধন্যবাদ,' বলে লেখাটা মাহমুদকে না দেখিয়েই বাথরুমে ঢুকল রানা। কাগজটা ছিঁড়ল ও, কমোডে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিল। তারপর আবার বেরিয়ে এল সিটিংরুমে।

সিটিংরুমটা বড় নয়, সংলগ্ন কিচেনটা ছোট্ট খুপরির মত। বেডরুমের সঙ্গে বাথ, তাতে শাওয়ারের ইকুইপমেন্ট ফিট করা আছে। বেডরুমের ওয়ার্ড্রোব আর মেডিসিন চেস্ট পরীক্ষা করে রানা নিশ্চিত হলো, রেদোয়ান আহমেদ হুট করে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান। ছোট্ট রিফ্রিজারেটরটা সাক্ষ্য দিচ্ছে তিনি গেছেনও বেশ কিছুদিন আগে।

'এগুলো আপনার দেখা দরকার, মিস্টার রানা,' বলল মাহমুদ, সুদৃশ্য একটা চেস্ট-অভ-ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কাগজ-পত্র দেখছে।

কয়েক পা এগোল রানা, তবে মাহমুদের দিকে খেয়াল নেই। ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ফ্রেমে বাঁধানো পূর্ণদৈর্ঘ্য একটা রঙিন ফটোগ্রাফ। ওহ্ গড, রানার অন্তরে কে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, রূপ বটে! ছবিটা তোলা হয়েছে কোন সৈকতে। গায়ে কিছু নেই বললে ভুল হবে, তবে না থাকবার মত আছে আর কী। মেয়েটার বয়স আন্দাজ করা অত্যন্ত কঠিন—অবশ্যই বালিকা নয়, তবে এখনও সম্ভবত পুরোদস্তুর নারীও নয়। চোখ দুটো প্রাণবন্ত, চোরা চাহনিতে সবজান্তার ভাব। সবই অত্যন্ত রমণীসুলভ এবং প্রতিশ্রুতিশীল, শুধু একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট বাদে। প্রকৃতি তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সত্যি খুব দুঃখজনক যে তার বুক ছেলেদের মত, প্রায় চ্যাপ্টা।

'ও, ওকে দেখছেন!' সরে এসে উঁকি দিয়ে রানার হাতের ছবিটা দেখল

মাহমুদ।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী পেলেন?'

'আমি তো এ-সব আগেই দেখেছি। আপনি দেখুন। দেখলে বুঝতে পারবেন ভদ্রলোকের লাইফ স্টাইল কেমন ছিল।'

বিশটা মেট্রো টিকিট, ব্যবহার করা হয়েছে আটটা। দু'ভাঁজ করা এনভেলাপের ভিতর একটা লন্ড্রীর স্লিপ পাওয়া গেল, লন্ড্রীটা রু টুর্নেফোর্ট-এ। প্যালাইস দ্য শাইলট-এ দু'হপ্তা আগে অর্কেস্ট্রা কনসার্ট হয়েছিল, তার বাতিল একজোড়া টিকিট–ব্যালকনি সিটের। ভাড়া মেটানোর রসিদে লেখা একটা গ্যারেজের ঠিকানা মনে গেঁথে নিচ্ছে রানা, এই সময় টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

মাহমুদের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার হাত রিসিভারের চারদিকে চেপে বসেছে, সেটার উপর রানার থাবা পড়ল। 'বাজতে দিন,' বলল ও, তার আঙুলগুলো আলগা করে ছাড়িয়ে আনছে। মাহমুদকে বিব্রত দেখাল, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছু হটল।

তৃতীয়বার রিঙ হবার পর রিসিভার তুলল রানা। 'আলো?' এমন সুরে ফ্রেঞ্চ বলছে, যেন সরাসরি নেপোলিয়নের বংশধর। ফ্রেঞ্চ আসলেও খুব ভাল বলে রানা, তবে ইচ্ছে করেই এমন কণ্ঠস্বর বের করল যেন মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে কথা বলছে।

অপরপ্রান্তের কথা কোন রকমে শুনতে পেল রানা। ভাষাটা ইংরেজি, তবে কণ্ঠস্বরের মালিক ইংরেজ তো নয়ই, এমনকী ফরাসীও নয়। কথাগুলো যেন শেখানো বুলি, স্রেফ আওড়ে গেল। 'মিস্টার আহমেদের যে সুটটা ইস্ত্রি করতে দেয়া হয়েছিল। রেডি হয়ে পড়ে আছে। স্লিপটা নিয়ে আসবেন।'

মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে থাকল রানা। ইতস্তত ভাবটা গোপন করবার জন্য খুক করে কাশল দু'বার। লোকটার কণ্ঠস্বর আরেকবার শুনতে চাইছে। 'মিনিট কয়েক আগে আপনিই কি কল করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, কথা বলল নরম সুরে, ধীরগতি ইংরেজিতে।

এক মুহূর্ত বিরতির পর: 'হ্যাঁ। কেউ সাড়া দেয়নি।' সতর্ক, সুচিন্তিত জবাবে অ্যারাবিক বাচনভঙ্গি স্পষ্টই বাজল কানে।

লোকটা কি তাহলে ইরাকি?

সারা দুনিয়ায় কোথাও কোন ড্রাই ক্লিনার কাস্টমারকে বারবার ফোন করে স্মরণ করিয়ে দেয় না যে তার কাপড় ডেলিভারি নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। বিশেষ করে স্লিপটা যদি কাস্টমারের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানো হয়। এরকম একটা রহস্যময় লোকের সঙ্গে বেশিক্ষণ লাইনে থাকা ঠিক নয়। নিজের ধারণা সত্যি কিনা যাচাই করবার ইচ্ছেটা দমন করল রানা। বিড়বিড় করে শুধু ধন্যবাদ বলে যোগাযোগ কেটে দিল।

'কে ফোন করেছিল?' জিজ্ঞেস করল মাহমুদ।

'লন্ড্রী,' বলল রানা, মাহমুদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। 'ওখানে একবার যেতে হবে আমাকে। তবে তার আগে শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাব।' কোঁচকানো জ্যাকেটটা খুলে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল। 'আপনি কিছু মনে করবেন গাড়ি থেকে ব্রিফকেসটা এনে দিতে বললে? তারপর আপনার এখানে না থাকলেও চলবে। তবে আপনি সাহায্য করায় ধন্যবাদ।' শেষ কথাটা বাথরুমের ভিতর থেকে চিৎকার করে বলল রানা।

গোসল করতে রানা খুব বেশি সময় নেয়নি। শাওয়ার বন্ধ করেই শুনতে পেল টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন আলাপ করছে মাহমুদ। আধখোলা দরজা দিয়ে বিছানায় ব্রিফকেসটা দেখা যাচ্ছে।

রানার কাপড় পাল্টানো হয়ে গেল অথচ মাহমুদের আলাপ আর শেষ হয় না। তার সামনে দিয়ে হেঁটে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসবে, এই সময় ফোনের রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে মাহমুদ বলল, 'মিস্টার রানা, সার, আপনি বোধহয় বেরুচ্ছেন? ঠিক আছে, বেরোন। রোজকার মত ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করে দেখি মিস্টার আহমেদ ফেরেন কিনা, তারপর আমিও চলে যাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল রানা, দরজাটা নিজের পিছনে বন্ধ করে দিল।

লন্ড্রীর একপাশে একটা কেমিক্যাল কোম্পানির শো-রুম, আরেক পাশে লেদার গুডস-এর স্টোর। লন্ড্রীর ভিতরটা ঘন বাষ্পে অস্পষ্ট হয়ে আছে। কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতে রানার হাত আর মুখে গরম ভাপ লাগল। একই সঙ্গে ন্যাপথার তীব্র ঝাঁঝ ঢুকল নাকে। কাউন্টারের পিছনে বয়স্ক লোকটা অকারণে হাসছে। তার মুখে অসংখ্য ভাঁজ দেখা যাচ্ছে, দাঁতগুলো ভাঙাচোরা। লোকটা চোখেও কম দেখে। শার্ট-প্যান্ট পরে থাকলেও, চেহারা আর আচরণ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় আরব। রানার হাত থেকে স্লিপটা নিয়ে পড়বার জন্য প্রায় নাকের কাছে তুলল।

তার মুখের হাসি উবে গেল। গলাটা লম্বা করে সাবধানে, খুঁটিয়ে, যথেষ্ট সময় নিয়ে দেখল রানাকে। বাতে আড়ষ্ট, রেখা আর ভাঁজবহুল একটা আঙুল তুলে রানার পিছনটা দেখাল। 'ওদিকে। রাস্তার ওপারে। এটা আপনি মুশতাককে দেখান। আপনার আসলে তাকেই দরকার।' তার ইংরেজি উচ্চারণে অ্যারাবিক বাচনভঙ্গি স্পষ্ট, টেলিফোনে যেমন লক্ষ করেছিল রানা। স্লিপটা ওর হাতে গুঁজে দিল সে। আঙুল ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার ইশারায় এই মুহূর্তে দোকান ত্যাগ করে চলে যাবার তাগাদা দিচ্ছে।

গোয়েন্দা কাহিনীর মত রহস্যময় হয়ে উঠছে পরিস্থিতি, রানা হাসতে পারছে না। যা কিছু ঘটছে সে-সবের পিছনে কোন কারণ না থেকে তো আর পারে না।

মুশতাকের দোকানে ঢুকছে। দরজা পেরোবার সময় মাথার উপর টুং-টুং করে একটা বেল বেজে উঠল। বেশ বড়সড় একটা কামরা, শব্দ তৈরির কারখানাই বলা যায়। মুশতাকের ব্যবসা ঘড়ি বেচা-কেনা। দেয়ালে ডজন ডজন ঘড়ি ঝুলছে, প্রতিটি সচল। টিক-টিক, টক-টক, ক্লিক-ক্লিক। বিভিন্ন ঘড়ির বিভিন্ন বোল। আর

কত রকমের যে দোলক। দরজার দু'পাশে ছ'ফুট উঁচু স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে মান্ধাতা আমলের একজোড়া ঘড়ি, যেন সতর্ক সেন্ট্রির মত পাহারা দিচ্ছে। দরজা থেকে ছ'ফুট ভিতরে, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কাউন্টার। কাউন্টারের দু'পাশে দেয়াল পর্যন্ত লম্বা দুটো শো-কেস। কাউন্টারের পিছনে এক লোক কুঁজো হয়ে একটা ওয়াচমেকার'স্ টেবিলে বসে কাজ করছে। কাঁচাপাকা পাতলা চুলের গোছায় কান দুটো প্রায় ঢাকা। লোকটার কাঁধ আর ধড় মাংস ও চর্বিতে ভরাট হয়ে আছে।

চোখ থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস সরিয়ে ঘাড় ফেরাল সে। মুখটাও ভরাট, চাঁদের মত গোল, বড়বড় চোখ দুটো একটু ভিতরে ঢুকে আছে। কঠিন, ঠাণ্ডা চোখে দেখছে রানাকে, যেন কাজে বাধা পেয়ে অসন্তুষ্ট। তালুর ঘড়িটা সাবধানে একধারে নামিয়ে রাখল সে। তারপর সিধে না হয়ে ওঅর্কটেবিল থেকে গড়িয়ে পিছিয়ে এল। ছোট্ট, ঘেরা কাজের জায়গা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত বোঝাই গেল না যে সে আসলে পঙ্গু। পেশীবহুল শক্তিশালী হাতের সাহায্যে হুইলচেয়ার চালাচ্ছে, শীর্ণ হাড্ডিসার পা দুটো পা-দানিতে।

লন্ড্রীর স্লিপটা কাউন্টারে রাখল রানা, সে যাতে সহজেই ওটা দেখতে পায়। লোকটা দেখল, তবে সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল রানার মুখে।

'আপনি মিস্টার ভুল দোকানে এসেছেন।' ইংরেজি নয়, ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল লোকটা। শব্দগুলো যাই হোক, উচ্চারণের ভঙ্গিতে প্রশ্নের সুর। চলে যেতেও বলছে না।

'আমাকে রাস্তার ওপার থেকে পাঠানো হয়েছে,' আরবীতে বলল রানা।

মুশতাকের পাতলা ভুরু এক কি দুই মিলিমিটার উঁচু হলো। 'এই স্লিপে তো কোন নাম দেখছি না,' বলল সে, বলবার ভঙ্গিতে উত্তর পাবার আশা প্রকাশ পেল।

'আমার নাম রানা, মাসুদ রানা–আমি ওমর খৈয়মের ভক্ত।'

ঝট করে রানার দিকে তাকাল মুশতাক। কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ও, উনিও?

'না, উনি মারা গেছেন কি না তা আমরা জানি না। তবে নিখোঁজ।'

'আপনি এখানে কীসে করে এলেন?'

'ট্যাক্সি করে।'

'ভুল করেছেন!' লোকটা হিসহিস করে উঠল। 'আসা উচিত ছিল মেট্রো ধরে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ঘুষ দেয়া যায়।' লোকটা নতুন কিছু বলছে না। একটু হাসতে হলো রানাকে। খোলাখুলি নিজের ভয় প্রকাশ করে মুশতাক আসলে জানিয়ে দিল ওকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করছে সে। 'আসলে কী ঘটছে বলুন তো এখানে?'

'বিপদ। আরবিটার আমাদের পিছনে লেগে গেছে।'

'ডক্টর মুবারক কোথায়?'

'সব কথা আমি জানি না। আমাকে শুধু দুটো ঠিকানা দেয়া হয়েছে।'

খসখস করে লেটার প্যাডে একটা ঠিকানা লিখল মুশতাক। মুখ তুলে বলল, 'সময় রাত দশটা।' দ্বিতীয় ঠিকানাটা লিখবার আর সময় হলো না, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল সে রাস্তার দিকে।

তিন

বন্ করে ঘুরল রানা, জানতে চায় কী দেখছে মুশতাক। রাস্তার একদিকে, ত্রিশ গজ দূরে একটা পার্কিং স্পেস, দোকানের ভিতর থেকে স্টোর অর্ধেক মাত্র দেখা যায়। বাকি অর্ধেকে লুকিয়ে ছিল সেই কালো সিত্রোঁটা, এই মুহূর্তে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে। ওটার জানালায় পাইপের মত জিনিসগুলো দেখে চমকে উঠল রানা। ওগুলোর মুখ এদিকে তাক করা।

টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ভাল একটা ফাঁদ তৈরি করেছে মুশতাক। সে যে তথ্যটা রানাকে দিয়েছে সেটা নির্ভেজাল আবর্জনা। সবার আগে তার ব্যবস্থা করা দরকার, তাই আবার ঝট করে আধ পাক ঘুরল রানা, কাঁধ ও মাথা নিচু করে। বিদ্যুৎগতি নড়াচড়ার মধ্যে হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার। এখনও ঘোরার মধ্যে রয়েছে রানা, পুরোপুরি মুখোমুখি হয়নি মুশতাকের—তাকে একটা লাশ বলে ধরে নিয়েছে—দেখল, ওর প্রতিক্রিয়া আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে লোকটা। তার হাতে একটা ডাবল-ব্যারেল শটগান। বাগিয়ে ধরে গুলি করতে যাচ্ছে। রেঞ্জ ছয় ফুটেরও কম।

শটগান গর্জে উঠল মুখের সামনে। রানার মাথাকে পাশ কাটিয়েছে চার্জটা। বাইরে গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল। দোকানের সামনের সমস্ত কাঁচ ঝন ঝন করে ভেঙে পড়বার শব্দ হলো।

ইতিমধ্যে রানার প্রস্তুতি শেষ হয়েছে, হাতের ওয়ালথার এখন মুশতাকের বাম বুকে তাক করা, এই সময় উপলব্ধি করল ও, এত কাছ থেকে লোকটা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হতে পারে না। তার মানে, তার টার্গেট ও ছিল না। টার্গেট ছিল রাস্তা ধরে ছুটে কাছে চলে আসা সিত্রোঁটা। মুশতাক ওর শত্রু নয়, মিত্র।

আবার সবেগে ঘুরল রানা, ঠিক তখনই দ্রুতগতি সিত্রোঁ থেকে দ্বিতীয়বার ফায়ার ওপেন করা হলো। বুলেটগুলো দরজার ফ্রেম চিবাচ্ছে, দু'একটা ওর মাথার কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়েও ছুটে গেল। কাঠের টুকরো তীরের মত আঘাত করছে সারা শরীরে। দরজার গায়ে ফিট করা কাঁচ বিস্ফোরিত হলো। চোখা, ধারাল টুকরোগুলো কাপড়ে বিঁধছে। পিস্তল তুলেই পর পর দুটো গুলি করল রানা। লাগাতে পারল দ্বিতীয়টা। গাড়ি ফুল স্পীডে ছুটছিল, হঠাৎ মাতলামি শুরু করে দিল। তারপরও অটোমেটিক রাইফেল দুটো অবিরাম গুলি বর্ষণ করে যাচ্ছে। লক্ষ্যভেদে পুরোপুরি সফল নয়, কিন্তু দোকানের ভিতরটা ভেঙেচুরে একেবারে

গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে মেঝে আলিঙ্গন করাই বুদ্ধিমানের কাজ, রানা করছেও তাই; সেই সঙ্গে অপেক্ষায় আছে কখন থামবে গোলাগুলি।

থামল অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ, প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের পর। মাথা তুলে তাকাল রানা। ওর বুলেট মাথায় ঢুকতেই ড্রাইভার সিত্রোঁ চালানো ছেড়ে দিয়েছিল, তবে তার নিষ্প্রাণ হাত দুটো হুইল থেকে পড়ে যায়নি। গাড়ি ফুটপাথে বাধা পেয়ে থামেনি, লাফ দিয়ে উঠে এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলেছে লন্ড্রী আর ওটার পাশের কেমিক্যাল শপের মাঝখানের দেয়ালটা। সিলেক্টর অটোমেটিকে দেওয়া ছিল, রাইফেল থেকে বেরুনো এক ঝাঁক বুলেট কেমিক্যাল শপের বড় বড় ড্রাম ফুটো করে দিয়েছে। নানা বিচিত্র রঙের রাসায়নিক পদার্থ হড়হড় করে বেরিয়ে এসে ফুটপাথ ভাসিয়ে দিচ্ছে। দুই দোকানের ভিতর ঢুকে পড়া সিত্রোঁর অর্ধেকটা বাষ্পে ঢাকা পড়ে আছে। ওই বাষ্পের উৎস লন্ড্রীর বিস্ফোরিত পাইপ। গ্যাসচালিত ওয়াটার হিটারও ভেঙে পড়েছে। ফলে ফাটল ধরা গ্যাস লাইন থেকে বিক্ষুব্ধ, রাগী একটা অগ্নিশিখা লাফ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। কমলা জিভ দ্রুত এগোচ্ছে গাড়ির নীচে জমতে থাকা গ্যাসোলিন লক্ষ্য করে। রানা বুঝল, ফুটপাথে ধাক্কা খেয়ে সিডানের ফুয়েল ট্যাংকে ফাটল ধরেছে।

তেল, গ্যাস, রাসায়নিক পদার্থ আর আগুন। এরপর কী ঘটবে সহজেই বোঝা যায়। রানা মাথা নামিয়ে নেবে, তার আগেই বিস্ফোরিত উত্তপ্ত বাতাস ধাক্কা মারল মুখে। উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা পুরু চাদর নিশ্চল গাড়িটাকে গ্রাস করল। দুটো মূর্তিকে দেখা গেল বাইরে বেরুবার জন্য গাড়ির দরজার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। প্যাসেঞ্জার সাইডের ফ্রন্ট ডোর জ্যাম হয়ে গেছে। ওটার পাশে আটকা পড়া চওড়া গোঁফওয়ালা লোকটার মুখ গম্ভীর থমথমে। তার জেদি, লালচে চেহারায় গভীর মনোসংযোগ আছে, ভয়ের লেশমাত্র নেই। শান্ত, ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে হাতের অটোমেটিক রাইফেলের কুঁদো ব্যবহার করে উইন্ডশীল্ডের কাঁচ ভাঙল, বেরুবার জন্য বড় একটা গর্ত তৈরি করছে। এছাড়া তার বাঁচার আর কোন উপায় নেই।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকটা সিত্রোঁর হুডে বেরিয়ে এল। দূর থেকে দেখেও রানা উপলব্ধি করল, তার কাঁধ দুটো এত চওড়া যে সাইড উইন্ডো দিয়ে গলত না।

ব্যাকসিটে তার লড়াকু সঙ্গী অবশেষে পিছনের দরজা খুলে ফেলল। মরিয়া লোকটা জ্বলন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে ধপাস করে আছাড় খেল রাস্তার উপর।

আরেকটা গুলি করল রানা। সেটা গোঁফধারী লোকটার পায়ের কাছে লেগে বাঁকা পথ ধরে শূন্যে উঠল, প্রায় অলৌকিক একটা গুঞ্জন তুলে কোন দিকে চলে গেল কে জানে। রাস্তায় পড়ে থাকা লোকটা টলমল করতে করতে সিধে হলো, তারপর বার কয়েক হোঁচট খেয়ে কালো ধোঁয়ার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশিষ্ট খুনীটা ঘুরল। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণ চোখে শেড পরিয়ে রেখেছে গোঁফের মতই চওড়া আর ঘন ভুরু। তারপর রাইফেলটা কাঁধে না

তুলেই, নিতম্বের কাছ থেকে শেষ এক পশলা গুলি করল। বাধ্য হয়ে মাথাটা নামিয়ে নিতে হলো রানাকে। তবে এই খুনীর চেহারাটা ওর মনে গাঁথা হয়ে গেল।

শরীরটা যথেষ্ট চওড়া, তবে মেদ নেই। লালচে মুখ ভিতর দিকে তোবড়ানো। কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। পাতলা ঠোঁটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে দু'সারি দাঁতের মাঝখানে ধরা সরু, কালো একটা চুরুট। আশ্চর্যই বলতে হবে যে মরিয়া হয়ে প্রাণ বাঁচানোর সময়ও চুরুটটা সে ফেলে দেয়নি। পরনে গাঢ় রঙের সুট, সাদা শার্ট, কালো টাই। একেই বোধহয় মুশতাক আরবিটার বলছিল।

সিধে হলো রানা। রাস্তার ওপারটা দেখে মনে হলো দান্তে-র ইনফার্নো-র দৃশ্য দেখাবার জন্য একটা মঞ্চ সাজানো হয়েছে। আর দু'এক মিনিটের মধ্যে ফায়ার ইকুইপমেন্ট আর পুলিশ চলে আসবে। তার আগেই অবশ্য পুড়ে নিঃশেষিত একটা খোল-এ পরিণত হবে গাড়িটা। দুর্ভাগা ড্রাইভারের লাশ প্রায় সবটুকুই আগুনের খোরাক হতে যাচ্ছে। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে।

ঘাড় ফিরিয়ে মুশতাকের দিকে তাকাল রানা, তার আগে না-জানি কী দেখতে হবে ভেবে মনটাকে শক্ত করে নিয়েছে। সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে সে। মাথাটা ধরে তুলতে বিস্ফারিত চোখে স্থির দৃষ্টি দেখা গেল। বুকের কাপড়ে এত রক্ত নিয়ে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। তার বিরাট বুকে গর্তগুলো অত্যন্ত ছোট লাগছে, তবে রানার পরীক্ষায় ধরা পড়ল ওগুলো ডাম-ডাম বুলেট–সংঘর্ষের সময় আকারে বড় হয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে ওগুলো। মুশতাকের প্রায় পুরোটা মেরুদণ্ড গুঁড়ো হয়ে গেছে, ফুসফুস দুটোর সঙ্গে মিশে হুইলচেয়ারের পিঠে মাখামাখি হয়ে আছে। রানা মাথাটা ছেড়ে দিতে আবার সেটা সামনের দিকে নুয়ে পড়ল। এবার মাথার পিছু নিল শরীরটাও, মুখ থুবড়ে পড়ল রক্তে পিচ্ছিল হয়ে থাকা মেঝেতে।

প্যাড থেকে দুটো পাতা টান দিয়ে খুলে নিল রানা। ঠিকানাটা দেখল–৮৭ নম্বর রু হেনড্রিক্স, প্লেইস দে লা ডুজন। দ্বিতীয় ঠিকানাটা জানতে পারল না বলে দুঃখ হচ্ছে।

দমকল কর্মীদের সাইরেন আর পুলিশ কারের অ্যালার্ম একই সঙ্গে শোনা গেল। রাস্তার ওপারে আগুনটা এখন আশপাশের আরও দোকানে ছড়িয়ে পড়েছে। কেমিক্যাল স্টোরের ভিতর থেকে পর পর কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। এবার রানাকে যেতে হয়।

কাউন্টার ডিঙিয়ে ওপারে চলে গেল রানা, সেখান থেকে একটা দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে গেল ছোট্ট উঠানে। খিড়কি দরজা খুলে সরু একটা গলি পাওয়া গেল। উঁকি দিয়ে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। গলিতে বেরিয়ে এসে ডান দিক ধরে হাঁটছে। ভাগ্যিস জ্যাকেটে রক্ত লাগেনি, লাগলে খুলে ফেলে দিতে হত। পাঁচ মিনিট হাঁটার পর বড় একটা রাস্তায় বেরিয়ে এল, জানে কেউ ওর পিছু নেয়নি। ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছে।

খালি একটা ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শীত ধরে গেল

রানার। তাপমাত্রা দ্রুত নীচে নামছে। কোত্থেকে হঠাৎ কুয়াশা এসে চারদিক ঢেকে দিচ্ছে। হাঁটা শুরু করল ও। সেন্ট জারমেইন দে প্রেস সেকশন-এর বিখ্যাত রু প্রাদৌজ-এ চলে এল, বিরাট সব ফ্যাশন হাউসগুলো এদিকেই ভিড় করে আছে।

লালমুখো লোকটা, চুরুট যার সার্বক্ষণিক সঙ্গী, সম্ভবত এয়ারপোর্ট থেকেই ওর পিছু নিয়েছে। লোকটা কি ওকে মারবার প্ল্যান করেছিল, না কি মুশতাককে? যে প্রশ্নটা মনে জাগা স্বাভাবিক, তা হলো, রেদোয়ান আহমেদ কি নিখোঁজ হওয়ার অভিনয় করছেন, সেই সঙ্গে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছেন কেউ যাতে তাঁর পিছু নিতে না পারে? তবে এ কাজে তিনি একদল খুনীকে ভাড়া করবেন, এটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি না তিনি দল বদল করে থাকেন।

ঘন কুয়াশা হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে পরিণত হলো। ভিজে ক্যাপটা মাথা থেকে খুলে একটা খালি ট্যাক্সির উদ্দেশে নাড়ল রানা। ওকে নিয়ে রু ক্লডি বার্নাড ধরে ছুটল ড্রাইভার।

রু ল্যাভেরিয়ারে পৌঁছাতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। বৃষ্টি আর ভেজা রাস্তায় টায়ারের শব্দ ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে। দীর্ঘ আকাশ-ভ্রমণজনিত ক্লান্তি পেয়ে বসছে ওকে।

রাত দশটা বাজতে এখনও অনেক দেরি। একটা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করতে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। দুটোই মাত্র পথ। হয় ৮৭ নম্বর রু হেনড্রিক্সে যাও, নয়তো গোটা ব্যাপারটা ভুলে থাকো।

মন্টমারট্রে-র পুব কিনারায় প্লেইস দ্য লা ডুঁজন ডিস্ট্রিক্ট একটু কমই চেনে রানা। আঠারোশো পঞ্চাশ সাল থেকে মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে জায়গাটাকে। ওদিকের আধুনিক বাড়ি বেশিরভাগই ডুপ্লেক্স। বাকি সব প্রায় পরিত্যক্ত।

২৮৭ নম্বরের কাছ থেকে খানিকটা দূরে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছে রানা, দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিংটার দিকে পিছন ফিরে। হাতে এক মুঠো ফ্রাঙ্ক গুঁজে দেওয়া সত্ত্বেও সেদিকে খেয়াল নেই ড্রাইভারের। 'ওদিকে দেখুন, মঁশিয়ে,' বলল সে। 'কী ঘটছে বলুন তো?'

ঘাড় ফিরিয়ে ২৮৭ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দিকে তাকাল রানা। ফুটপাথ ঘেঁষে একটা পুলিশ কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। একপা-দুপা করে এগিয়ে এসে দেখল দালানের ভিতর ঢোকার দরজাটা হা-হা করছে। টাইল বসানো লবির মেঝেতে গিজ গিজ করছে লোকজন। চারদিকটা প্রথমে ধীরেসুস্থে ভাল করে দেখে নিল রানা। তারপর সাবধানে এগিয়ে ভিড়ের ভিতর ঢুকল। লোকগুলো সবাই এলিভেটর শাফটের দিকে মুখ করে রয়েছে। প্যাসেঞ্জার ক্যাব নীচে নামানো হয়েছে, ফলে ওটার ছাদ এখন লবির মেঝের সঙ্গে প্রায় একই লেভেলে। ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিশকে দেখল রানা। এলিভেটর ক্যাব ওঠা-নামা করায় যে-সব গিয়ার আর কেবল, সেগুলো থেকে থেঁতলানো আর মোচড়ানো একটা রক্তাক্ত লাশ ছাড়াচ্ছে তারা। লাশের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, চোখের নীচের

চামড়া পুড়ে গেছে, মুখের ভিতর কাপড় গোঁজা।

লাশটা রানার চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আরবিটার বা তার লোকজন খুন করবার আগে ইন্টারোগেট করেছে মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের জুনিয়র এজেন্ট শাকিল মাহমুদকে। তবে এখন আর জানবার কোন উপায় নেই, অসহ্য নির্যাতন সহ্য করবার সময় প্রতিপক্ষকে কী বলেছে সে।

সুযোগ আছে, গা বাঁচিয়ে কেটে পড়তে পারে রানা। কিন্তু সেক্ষেত্রে রেদোয়ান আহমেদের ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে দেবে পুলিশ। এটা হতে দিতে চায় না ও। ওর ধারণা, রেদোয়ান আহমেদ কোন এক সময় নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতেও পারেন। ফ্ল্যাট থেকে নতুন আর কোন সূত্র পাওয়া যাবে না, তাই-বা কে বলল? তা ছাড়া, পুলিশের কাছ থেকে না পালিয়ে বরং চেষ্টা করা দরকার কৌশলে সহযোগিতা আর তথ্য আদায় করা যায় কি না। ওরা হয়তো লালমুখো লোকটাকে চেনে।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল রানা। পাঁচ তলায় পৌঁছে দেখল রেদোয়ান আহমেদের ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙা হয়নি, তবে সবগুলো কামরাতেই ধস্তাধস্তির চিহ্ন স্পষ্ট। উপস্থিত ইন্সপেক্টর দুঁ সাপিন-কে নিজের পরিচয় দিল ও: 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মাসুদ রানা।' ইন্সপেক্টর পরিচয়টাকে গুরুত্ব দেয়ায় আচরণে ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ফরাসী ভাষায় আরও বলে গেল: আজ সকালে ঢাকা থেকে প্যারিসে পৌঁছেছে ও। বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি রেদোয়ান আহমেদ ওর বন্ধু মানুষ, তিনি অন্যত্র জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর একজন মিশরীয় বন্ধুকে বলে রেখে গিয়েছিলেন এয়ারপোর্টে গিয়ে ওকে রিসিভ করে আনতে।

না, মঁশিয়ে রেদোয়ান সম্ভবত প্যারিসে নেই। তবে মিশরীয় বন্ধু শাকিল মাহমুদকে বলেছেন, দু'চারদিনের মধ্যে ফিরে আসবেন। কথার খেই ধরে রানা আরও জানাল, গত হপ্তায় মিশরীয় দূতাবাসের একজন অফিসার খুন হয়েছেন, সেই কেসটা তদন্ত করতেই প্যারিসে এসেছে ও। ভদ্রলোকের নাম ছিল ইয়াকুব মালিক। মঁশিয়ে শাকিলের কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জেনে নিয়ে অকুস্থল, অর্থাৎ ভদ্রলোক যেখানে খুন হয়েছেন সেই রু ভাউলায়ার গেটে গিয়েছিল ও। এইমাত্র ফিরে দেখছে মঁশিয়ে শাকিল মারা গেছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা কীভাবে ঘটল?

ইন্সপেক্টর দুঁ সাপিন জানাল, 'এলিভেটর জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। গোলমালটা কোথায় দেখার জন্যে দারোয়ানকে ডাকা হয়। সে এসে দেখে মঁশিয়ে শাকিলের পা গিয়ার-এ আটকে রয়েছে। মঁশিয়ে শাকিল আগেই মারা গিয়েছিলেন। নির্যাতন করে খুন করা হয় তাঁকে, তারপর ধাক্কা দিয়ে পাঁচতলা থেকে নীচে ফেলে দেয়া হয়।'

'আপনার কী ধারণা, প্রথম খুনটার সঙ্গে এটার সম্পর্ক আছে?' প্রসঙ্গটা তুলবার সুযোগ পেয়ে রানা হাতছাড়া করছে না।

'প্রথম খুন?'

'মঁশিয়ে ইয়াকুব মালিক।'

'ওহ্! ওই কেসটা আরেক পুলিশ স্টেশন সামলাচ্ছে। তবে মঁশিয়ে মালিক যেভাবে খুন হয়েছেন তাতে সবাই সন্দেহ করছে কাজটা সম্ভবত আরবিটারের। আমি তো এটাতেও তার ছাপ দেখতে পাচ্ছি।'

'আরবিটার?'

'হ্যাঁ। লোকটা জার্মান ইহুদি। আসল নাম সেডরিক থান্ডার। তার একটা দুর্ধর্ষ দল আছে।'

'তাকে আপনারা ধরছেন না কেন?'

'চেষ্টা চলছে। বারবার ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যায়।'

এরপর রানাকে নিয়ে নীচে নেমে এল ইন্সপেক্টর। মাহমুদের লাশ ভাঁজ করা একটা ক্যানভাসে শুইয়ে মোটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। মোবাইল ফোন বন্ধ করে কনেস্টবলদের ইন্সপেক্টর সাপিন জানাল–মিশরীয় দূতাবাসের লোকজন মর্গে গিয়ে লাশ সনাক্ত করবেন।

পুলিশ স্টেশনে যাবার পথে রানা ভাবছে, রু ল্যাভেরিয়ারে মিশরীয় শাকিল মাহমুদ আর টুর্নেফোর্টে ইরাকি মুশতাক হত্যাকাণ্ড যে একই সুতোয় গাঁথা ইন্সপেক্টর সাপিন খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই তা ধরতে পারবে না।

রানার হিসাবে, ও যখন রু ভাউলায়ার গেটে যাচ্ছে ঠিক তখন সঙ্গীদের নিয়ে রেদোয়ান আহমেদের ফ্ল্যাটে ঢুকে মাহমুদকে ধরে আরবিটার তথ্য আদায়ের জন্য। মাহমুদের মুখে আগুনের ছ্যাকা, গলার ভিতর গোঁজা কাপড় আর বাঁধা হাত দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় লন্ড্রীর ঠিকানাটা সহজে দেয়নি সে। ঠিকানা পেয়ে আরবিটার আর তার সঙ্গীরা দেরি করেনি, মাহমুদের মৃত্যু নিশ্চিত করে লন্ড্রীর উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। বেচারা মাহমুদের জন্য দুঃখ বোধ করছে রানা।

পুলিশ স্টেশনে বেশ খাতির করেই বসানো হলো রানাকে। তবে জেরা চলল নিয়ম ধরেই। এক পর্যায়ে রানার পরিচয় যাচাই করবার প্রশ্নও উঠল। রানা জানাল ওর পাসপোর্ট রেদোয়ান আহমেদের ফ্ল্যাটে, ব্রিফকেসের ভিতর আছে। সাপিন বলল, সার্চ করে ফ্ল্যাটে একটাই ব্রিফকেস পেয়েছে তারা, খোলা, কিন্তু তাতে কোন পাসপোর্ট ছিল না। রানা সন্দেহ প্রকাশ করল, ওর পাসপোর্ট তাহলে আরবিটার নিয়ে গেছে।

পাসপোর্ট চুরি গেছে, কাজেই একটা জিডি করতে হলো রানাকে। ইন্সপেক্টর সাপিন অনুরোধ করল, অফিসের কাউকে ডেকে নিজের পরিচয়টা প্রমাণ করুক রানা।

নিজ এজেন্সির প্যারিস শাখায় ফোন করল রানা। শাখা প্রধানের নাম [illegible] রিচয় ওর জানা নেই, তবে জবাব দিল মধুকণ্ঠী এক মেয়ে। রানার পরি[illegible] শুনে বি[illegible]স্মিত ও খুশি হলেও, উচ্ছ্বসিত হলো না। বলল, 'আমি সুরভি, মাসুদ [illegible]াই [illegible] দেশ করুন।'

'কোন সুরভি?'

হেসে ফেলল মেয়েটা। 'আমাকে আপনার না চেনারই কথা। ট্রেনিং শেষ করে বিসিআই-এ যোগ দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু বস্ আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন।'

'কবে?'

'এই মাসখানেক হলো।'

'ঠিক আছে। শোনো। চেম্বারে একটু খোঁজো, আমার ব্রিটিশ পাসপোর্টটা পেয়ে যাবে। ওটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো পুলিশ স্টেশনে চলে এসো। ঠিকানাটা লিখে নাও...'

সুরভিকে এই প্রথম দেখছে রানা, অথচ কেন যেন মনে হচ্ছে আগেও কোথাও দেখেছে। এ মেয়ের হাঁটা চলায় ছন্দ আছে, শরীরে আছে যৌবন। বড় বড় চোখ দুটো বিষণ্ন হলেও, মায়া ঝরিয়ে কী যেন বলতে চায়। তার হাত থেকে পাসপোর্টটা নিয়ে একবার চোখ বুলাল ইন্সপেক্টর সাপিন, ফিরিয়ে দিয়ে রানাকে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে সত্যি দুঃখিত। বলুন তো ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিই আপনাকে।'

'ধন্যবাদ, আমরা হাঁটব,' বলে সুরভিকে নিয়ে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল রানা। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল ওরা।

রানার মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল: প্যাড থেকে দুটো কাগজ খুলে নিয়েছি, কিন্তু তৃতীয়টায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডার ছড়ালেই তো লেখাগুলো ফুটে উঠবে। পুলিশ কি সেটা পাবে? পেলে গুরুত্ব দেবে? কিংবা মুশতাক সত্যি মারা গেছে কি না জানবার জন্য আরবিটারের কি সাহস হবে দোকানটার ভিতর ঢুকবার? যদি ঢুকে থাকে, সে কি দোকানটা সার্চ করেছে? পেয়েছে প্যাডটা? তার জায়গায় আমি হলে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ঘড়ির দোকানটায় ঢুকে ভালমত একবার তল্লাশী চালাতাম।

'দূতাবাসের মাধ্যমে রেদোয়ান আহমেদ তোমার কাছে আমাদের কোন সেফ হাউসের ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল সুরভি। 'না তো।'

'৮৭ নম্বর রু হেনড্রিক্স,' বলল রানা। 'চেনো?'

মাথা নাড়ল সুরভি। 'নাহ্।'

'ভুলে যাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'এবার বলো, দূতাবাসের কার মাধ্যমে আমাদের প্যারিস শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তিনি।'

'বড়দা প্রয়োজনে সরাসরি অ্যামব্যাসাডরকে ফোন করতেন, অ্যামব্যাসাডরও সরাসরি আমাকে।'

'বড়দা?' বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে রানা।

'হ্যাঁ,' ম্লান মুখে বলল সুরভি। 'আমি তাঁর ছোট বোন। তবে বড়দার আসল নাম রেদোয়ান আহমেদ নয়।'

'গুড গড! তোমাদের চেহারায় মিল আছে, সেজন্যেই চেনা চেনা লাগছিল...'

'মাসুদ ভাই,' রানার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল সুরভি, উনি কি বেঁচে আছেন?'

'আমি তো আজই মাত্র এলাম,' বলল রানা। 'তোমাদের তদন্ত কী বলছে?'

'কীসের তদন্ত! আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি।'

'কেন?'

'আপনি যাতে একটা ক্লিয়ার ফিল্ড পান, বস্ তাই আমাদেরকে সাইড লাইনে বসে থাকতে বলেছেন। তা ছাড়া, এটা নাকি একজনের অ্যাসাইনমেন্ট–আপনার, শুধু মাসুদ রানার।'

তিক্ত প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার সুরভি উচ্চারণ করবার সুযোগ পেল না, একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে তুলে দিল রানা। খানিকটা হেঁটে নিজেও একটা ট্যাক্সি নিল। প্রশ্নটা একা সুরভির নয়, রানারও। রেদোয়ান আহমেদ কি সত্যি বেঁচে আছেন? কারও লাশ পাওয়া না গেলেই কি আশা করা উচিত যে সে বেঁচে আছে?

রেদোয়ান আহমেদের ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় রানা সিদ্ধান্ত নিল, দূতাবাসকে পরামর্শ দেবে আর দেরি না করে প্যারিস পুলিশকে জানানো দরকার যে প্রায় একশো ঘণ্টা হতে চলল রেদোয়ান আহমেদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢুকবার আগে দু'দিকের রাস্তা আর আশপাশটা ভাল করে দেখে নিল রানা। শান্ত ও স্বাভাবিক পরিবেশ। তবে তার মানে এই নয় যে ওর উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু ঘটছে না। মুখ ভার করে থাকা আকাশের দিকে তাকিয়েছে, পাঁচতলার একটা জানালায় নড়াচড়া চোখে পড়ল।

চার

শিম, ফুলকপি আর পুদিনা পাতার ঝাঁঝাল গন্ধে ভরাট হয়ে আছে লবি। দেখে মনে হলো এলিভেটর ব্যবহার করা যাবে, তবে সিঁড়ি বেয়েই উঠল রানা। রেদোয়ান আহমেদের ফ্ল্যাটের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো বেরুচ্ছে। ওটার পাশে দাঁড়াল ও, কান পাতল। কবাটে কান ঠেকাতেও ভিতরের কোন শব্দ শুনতে পেল না। নব ঘোরাতে কাজ হলো না, স্ন্যাপ-লক ল্যাচ জায়গামত ফেলা আছে। তবে একটা প্লাস্টিক কার্ডের কিনারা দিয়ে সাবধানে চাপ দিয়ে সরানো গেল।

সিটিংরুম খালি, প্রায় অন্ধকার। বেডরুমের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো বেরিয়ে আছে। পা টিপে টিপে দরজার পাশে এসে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা। এখনও কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

হাতে বেরিয়ে আসা ওয়ালথার নিয়ে লাফ দিল ও, দরজায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে

ওয়ারড্রোবের পাশে পড়ল।

'ওহ্!' স্বর্ণকেশী একটা মেয়ে, নীল চোখ বিস্ফারিত। ঝট করে বিছানায় উঠে বসল। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ।

মেয়েটা দ্রুত নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে, ধীরে ধীরে পিছু হটে খাটের একেবারে শেষ মাথায় পৌঁছে গেল।

রেদোয়ান আহমেদের প্রেমিকা রানা যেমনটি আশা করেছিল তেমনটি নয়। সিধে হলো ও, জ্যাকেটের ভিতর পিস্তলটা রেখে দিয়ে বিছানার দিকে এগোল। 'ভয় পাবার কিছু নেই,' বলল ও। 'কিন্তু এখানে আপনি কী করছেন?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন, মঁশিয়ে,' আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে মেয়েটা, সাহস করে হাসল একটু। 'আমি শ্রেয়ার লেনা,' প্রায় গর্বের সুরে বলল সে, যেন আর কিছু ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই।

বিছানার কিনারায় বসল রানা। ওকে হাত বাড়াতে দেখে কুঁকড়ে গেল মেয়েটা। রানার ঠোঁটে আশ্বস্ত করবার হাসি, তবে হাত ফিরিয়ে নিল না। ওর আঙুল লেনার গলায় পরা সোনার চেইনের সঙ্গে ঝুলন্ত লকেটটা স্পর্শ করল। এরকম অদ্ভুত আকৃতির লকেট আগে কখনও দেখেনি ও। চেইনটা সোনার, অথচ লকেটটা ইস্পাতের। হুবহু না হলেও, দেখতে প্রায় একটা চাবির মত। মেয়েটা আড়ষ্ট হয়ে আছে দেখে হাতটা টেনে নিল রানা।

'এখানে আমি প্রায়ই আসি, বলতে পারেন সেটা আমার একরকম অধিকারই। আমাকে গ্রহণও করা হয় আন্তরিকতার সঙ্গে।'

বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ফ্ল্যাটটা এখন আমি ব্যবহার করছি, তাই ভাবছি আপনি ভেতরে ঢুকলেন কীভাবে।'

'ওহ্, মঁশিয়ে!' হেসে উঠল চঞ্চল মেয়েটা। 'কেউ আমাকে ভালবাসলে তার ফ্ল্যাটের একটা চাবি সে আমাকে দেবে না?'

মেয়েটার দিকে একটানা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছে না রানা। দীর্ঘ পা, কদলীকাণ্ডের মত উরু, গুরু নিতম্ব, চিকন কোমর–দেখতে না চাইলেও দেখতে হয়। সুদৃঢ় স্তনযুগল পাতলা নেগলিজেকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্য সারাক্ষণই লড়াই করছে। ঠিকই বলছে সে: লেনার ফ্যানট্যাসটিক শরীরটাই যে-কোন পুরুষের ফ্ল্যাটে ঢুকবার জন্য সেই বিখ্যাত মন্ত্র চিচিং ফাঁক হিসাবে কাজ করবে।

'ঠিক আছে, বোঝা গেল এখানে আপনি আগেও এসেছেন,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন কেন? কতক্ষণ হলো ঢুকেছেন?'

'এইমাত্র এসেছি। অবশ্য কেউ আমাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখেনি। কেন এসেছি? কেন আবার, রেনাদের জন্যে অপেক্ষা করব, তাই।'

রেনাদ মানে নিশ্চয়ই রেদোয়ান আহমেদ, ধরে নিল রানা। 'ও, হ্যাঁ, রেনাদ,' বিড়বিড় করল। 'এখানে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা করার কথা?'

'দেখা তো হবেই। তবে কোন কথা হয়নি। সে জানে না আমি ফিরে

এসেছি। সারপ্রাইজ দেব বলে ইচ্ছে করেই জানাইনি।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'চাবি যখন আছে, এখানে আপনার আসাটা রেনাদের জন্যে সারপ্রাইজ হবে কেন?'

'শুনুন,' ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করছে লেনা, রানার বুঝতে যাতে সুবিধে হয়। 'অনেক দূর থেকে এইমাত্র ফিরছি আমি। আশা করি ও রাগ করবে না। বলেছিল ওখানেই যেন থাকি, নিজে গিয়ে নিয়ে আসবে আমাকে। কিন্তু ওকে ওর এই জিনিস দেখাবার লোভটা সামলাতে না পেরে চলে এসেছি।' রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে ইঙ্গিতে নিজের সুডৌল স্তনযুগল দেখাল লেনা। 'দেখছেন? এগুলো ওর জন্যে একদম নতুন। ও আমাকে টাকা দিল, তারপর···যেন জাদুবলে এগুলো বিরাট হয়ে গেল! সুন্দর না?' চোখের দৃষ্টি দেখে রানা নিশ্চিত হলো, মেয়েটা ওকে মোটেও প্ররোচিত করছে না, স্রেফ একটা ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। 'এগুলোই হলো সারপ্রাইজ, বুঝলেন?' হঠাৎ করে সতর্ক দেখাল তাকে। 'আচ্ছা, আপনি কে বলুন তো? রেনাদকে আপনি কীভাবে চেনেন?'

দক্ষ হাতের নিপুণ প্লাস্টিক সার্জারির ফলে তার প্রায় সমতল বুক নিখুঁত আর ভয়ানক লোভনীয় একটা আদল পেয়েছে। 'রেদোয়ান আহমেদ আমার একজন পুরানো বন্ধু,' কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বলল রানা, লেনা যাতে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে। 'তা না হলে সে তার ফ্ল্যাট আমাকে ব্যবহার করতে দেবে কেন।'

'তাই তো,' সায় দিল লেনা।

'কথাটা শুনে তুমি কিন্তু মন খারাপ কোরো না, লেনা,' বলল রানা। 'আজ রাতে রেনাদকে আমরা এখানে দেখতে পাব না বলে ধরে নেব। প্রায় এক হপ্তা হতে চলল এই ফ্ল্যাট ব্যবহার করছে না সে।'

হতাশার বদলে সন্তুষ্ট দেখাল লেনাকে। 'তাহলে সে তার কাজে ফিরে গেছে। আমাকে পাঠাবার ঠিক আগে তাকে আমি কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে দেখেছিলাম।'

'কেন, কী নিয়ে দুশ্চিন্তা?'

'তা তো জানি না।' বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাত দুটো একটু মেলল লেনা। 'রেনাদ আমার সঙ্গে কথা খুব কমই বলে। আমিও।' গোপন কী যেন মনে পড়ে যেতে মুখের হাসিটুকু আড়াল করল সে। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখাল। 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন। প্লিজ, বসুন।'

রানা বসল না, তাকিয়ে আছে লেনার গলার লকেটটার দিকে। 'রেনাদ আপনাকে জানায়নি, আবার আপনারা পরস্পরের সঙ্গে কবে দেখা করবেন?'

'না। বলেছিল ও আমাকে আনতে যাবে। আপনি বসছেন না কেন, মঁশিয়ে? চলে যাবেন নাকি? প্লিজ, আমাকে একা রেখে কোথাও যাবেন না।' হঠাৎই মেয়েটাকে অত্যন্ত সিরিয়াস দেখাল। 'একা থাকতে আমার ভীষণ ভয় করবে।'

'ভয় করবে? কেন?'

'কারণ রেনাদ বলেছিল এই ফ্ল্যাট আমার জন্যে নিরাপদ নয়। আমার কথা

ভেবে ভয় পাচ্ছিল সে। সেজন্যেই না অপারেশনের জন্যে তাড়াতাড়ি সুইটজারল্যান্ডে পাঠিয়ে দিল!'

'তোমাকে সে বাধ্য করে যেতে?'

'তবে আর বলছি কী। যখন দেখল তাকে একা ফেলে কোথাও যেতে রাজি নই আমি, তখন আমার শারীরিক ত্রুটির কথা তুলে লজ্জা দিল। বলল, আমার নাকি বুকই নেই। তারপর এক গাদা টাকা দিল আমাকে, বলল–যাও, ওগুলো বড় করে আনো।

'প্রথমে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। এ-ধরনের অপারেশন প্যারিসেই তো ভালভাবে হচ্ছে, আমাকে তাহলে সুইটজারল্যান্ডে যেতে হবে কেন? কিন্তু রেনাদের একই জেদ, অপারেশনটা ওখানেই করাতে হবে। অগত্যা বাধ্য হয়ে তাই গেলাম। ওখানে যাবার পর বুঝতে পারি, আমাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার পিছনে একটাই কারণ–তার বিপদের সঙ্গে আমি যেন না জড়াই।'

'কি ধরনের বিপদ?'

'ঠিক বলতে পারব না। কেউ বোধহয় তাকে চাপ দিচ্ছিল।'

'মানে হুমকি দিচ্ছিল?'

'বোধহয়। একদিন বলল, কোণঠাসা হয়ে পড়ছি, একা বোধহয় সামলাতে পারব না।'

'কে হুমকি দিচ্ছিল? কোন নাম বলেছে?'

'না। আসলে সব কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সময় পায়নি। আমি তাকে ছেড়ে যাব না, সে-ও আমাকে থাকতে দেবে না। চলে যাবার পর বুঝতে পারি, অপারেশনটা ছিল স্রেফ একটা অজুহাত।'

'তার সঙ্গে শেষ কবে তোমার কথা হয়?'

'পাঁচদিন আগে। বলল আমি যেন আর ক'টা দিন অপেক্ষা করি, তারপরই প্যারিসে ফিরতে পারব। হাসপাতালে ফোন করেছিল, আমি তার পাঠানো ফুল আর ছোট্ট এনভেলাপটা পেয়েছি কিনা জানতে।'

'এ-কথা বলেছিল, প্যারিসে ফিরলে কোথায় তোমাদের দেখা হবে?'

'না। ভাবলাম এখানেই আসি।' গলার চেইনটা দু'আঙুলে ধরল লেনা, চাবিটা দোল খাচ্ছে। 'ফুলের সঙ্গে একটা এনভেলাপে এটাও ছিল।' সুখী ও গর্বিত মেয়েটার চোখে আনন্দ চিক চিক করছে।

'কিছু যদি মনে না করো, গলা থেকে চেইনটা একবার খুলবে? আমি ওটা পরীক্ষা করতে চাই।'

লোকটা চোর? ডাকাত? খুনী? দ্বিধায় পড়ে গেল লেনা। তারপর ভাবল, এত সুন্দর চেহারা দশ লাখেও একটা পাওয়া যায় না, প্রায় রেনাদের মতই, সে কী করে চোর হয়। তা ছাড়া, রেনাদের বন্ধু না!

চেইনটা তালুতে নিয়ে লকেট, অর্থাৎ চাবিটা খুঁটিয়ে দেখছে রানা। এরকম একটা চাবি লেনার মত মেয়ের কাছে থাকবার কথা নয়। সোনার একটা চেইনের

সঙ্গেও বেমানান। লম্বা, সরু, টেমপারড্ স্টীল-এর একটা শাফট, ডিজাইন করা হয়েছে সঙ্কীর্ণ কী হোলে ঢুকাবার জন্য। হয়তো কোন প্যাডলকের চাবি, কিংবা কোন দেরাজের। চাবিটার মাথার দিকটা চওড়া, তাতে 5173 খোদাই করা রয়েছে, পাশে রয়েছে দুটো অক্ষর–MP।

চাবির সরু দিকটা দু'আঙুলে ধরে লেনাকে দেখাল রানা। 'কী এটা?'

প্রথমে ম্লান হয়ে গেল মেয়েটা। তারপর কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের তারায়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের বউকে তো চেনেন? এই চাবি বোধহয় তার চ্যাস্টিটি বেল্টে ফিট করে।' খিলখিল হাসি অনেক কষ্টে থামাল। 'আমি কী করে জানব?'

রানার চোখ চাবিটার উপর। 'রেনাদ কখনও রু হেনড্রিক্সের কোন বাড়ির কথা বলেছে তোমাকে? কিংবা মুশতাক নামে কোন পঙ্গুর কথা? লোকটা রু টুর্নেফোর্ট-এ একটা ঘড়ির দেকান চালায়।'

'না। না! এ-সব আমি কিছুই জানি না। বললাম না, রেনাদ কথা খুব কম বলে! তা ছাড়া, নিজের কাজের সব কথাই গোপন করে রাখে সে।'

লেনার চেইনের চাবিটা কোন গাড়ির ইগনিশনে ফিট করবে না, ভাবল রানা। তা না ফিট করুক, গাড়ির প্রসঙ্গ মাথায় একটা আইডিয়া এনে দিল। ধরে নিতে হবে রেদোয়ান আহমেদ নিজের পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে নিশ্চয়ই অফিশিয়াল গাড়ি ব্যবহার করছেন না। কী ব্যবহার করছেন জানার অন্তত একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গটা কৌশলে তুলতে হবে। একের পর এক প্রশ্ন করায় বিরক্ত হয়ে আছে লেনা। 'রেনাদ কি এখনও তার সেই রেনাওটা চালাচ্ছে?'

'রেনাও? নাহ্! এখন তো সে ইংলিশ অটোমোবাইল চালায়। একটা স্পোর্টস কার। এই তো, কাছেই একটা গ্যারেজে রাখে।'

রানা উত্তেজিত, তবে চেপে রাখছে। 'কাছাকাছি বলতে?'

'এই তো, দুই ব্লক পরে।' হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল লেনা। 'রিপেয়ার গ্যারেজ ছিল, কিন্তু ব্যবসা না চলায় বন্ধ হয়ে গেছে। রু ল্যাসেভান্ট-এর গলিতে ওটা।'

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে কোথাও বোধহয় লাগাতে পেরেছে রানা। এমন মনে করবার কারণ আছে যে রেদোয়ান আহমেদ এই মুহূর্তে যেখানেই থাকুন, তাঁর এই নতুন গাড়িটা করেই সেখানে গেছেন তিনি। তবে কেউ একজন তাঁর কাছ থেকে গ্যারেজের ভাড়া ঠিকই সময় মত আদায় করে নিয়েছে। এই লোককে পেলে আশা করা যায় গাড়িটার লাইসেন্স নম্বর জানা যাবে।

অন্তত কাজ শুরু করবার মত একটা কিছু পাওয়া গেল হাতে।

শুধু কসমেটিক সার্জারির জন্য লেনাকে সুইটজারল্যান্ডে পাঠাননি রেদোয়ান, বিপদ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে তাকে তিনি নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেন। সন্দেহ নেই, টান-টান ঝুলন্ত রশির উপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল তাঁকে। তবে

বিপদটা বোধহয় কেটে যাবার লক্ষণও দেখা দেয়, তা না হলে ফোন করে লেনাকে বলতেন না যে দিন-কয়েকের মধ্যেই প্যারিসে ফিরতে পারবে সে। এ থেকে রানার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল, রেদোয়ান নিজেও হয়তো আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন এবার।

বাথরুমে ঢুকেছিল, ফিরে এসে রানার দিকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল লেনা। 'আচ্ছা, আপনি কি রেনাদের দেশ থেকে আসছেন? মানে বাংলাদেশ থেকে?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'না, মানে, বলেছে দেশে ওর নাকি বউ-বাচ্চা আছে। কিন্তু বলার সময় এমন হাসে, মনে হয় ঠাট্টা করছে...'

রানা গম্ভীর হলো। 'ও আপনাকে ঠকাচ্ছে, বুঝলেন? ওর বউ একটা নয়, চারটে।' আঙুল খাড়া করে দেখাল রানা। 'আর বাচ্চাকাচ্চা সব মিলিয়ে নয়টা।'

'এটা আপনি কত নম্বর গুল মারছেন, মঁশিয়ে–?' চোখ বড় বড় করল লেনা। 'মেরির কিরে, আপনি আমাকে নিজের নাম বলেননি।'

'রানা। শুনুন। আমি চলে যাবার পর ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। শুধু আমার বা রেনাদের গলার আওয়াজ পেলে দরজা খুলবেন। মনে থাকবে তো?'

মাথা ঝাঁকাল লেনা। 'আপনি কথা দিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।'

'মনে আছে,' বলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল রানা।

প্যারিসে সন্ধ্যা নেমেছে। রূপসী রাজধানী এখন সাজগোজ করে নগরবাসীকে আনন্দ উল্লাসে গা ভাসানোর আহ্বান জানাবে। বাতাস এখনও ভেজা-ভেজা। রানা জানে রাস্তার কোথাও কোন কালো সিত্রোঁ অসৎ উদ্দেশ্যে লুকিয়ে নেই, তারপরও দু'দিকে অত্যন্ত সাবধানে চোখ বুলাল। পরিবেশ স্বাভাবিক। একটা বাড়ির সামনের ধাপে বসে দু'জন লোক গল্প করছে, বসবার ভঙ্গি ঢিলে-ঢালা। একজন একটা পাইপ টানছে। হেঁটে বাঁকটার দিকে যাবার সময় কাঁধের উপর দিয়ে বারবার পিছনটা দেখে নিল।

রু ল্যাসেভান্ট-এর গলিটা যথেষ্ট চওড়া, তবে অন্ধকার। বেশ খানিকটা এগোবার পর যেখানে গ্যারেজ থাকবার কথা সেখানে একটা দুর্বল বালব জ্বলতে দেখা গেল। দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত, এরকম একজোড়া ওয়্যারহাউস-এর মাঝখানে ইঁটের তৈরি একটা পুরানো দালান। দুটোর সবগুলো জানালাই বন্ধ করে লোহার পাত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সহজে যাতে কেউ খুলতে না পারে। গলিটায় কারও আসা-যাওয়া নেই, যেন কেউ ব্যবহার করে না। রানা নিশ্চিত, কেউ ওকে অনুসরণ করে আসেনি; কিন্তু প্রায় অন্ধকার গলিটার ভিতর এত অদ্ভুত আকৃতির সব ছায়া দেখতে পাচ্ছে, কার না গা ছম ছম করবে।

জোরে পা চালিয়ে গ্যারেজটার সরাসরি সামনে চলে এল রানা। পুরানো, রঙ ওঠা দরজায় 'প্যাডলক' ঝুলছে। তালাটা নতুন। কড়া দুটোয় মরচে ধরে গেলেও, মোটা কবাটের গভীর পর্যন্ত গাঁথা। এদিক দিয়ে ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

গ্যারেজ আর তার ডান পাশের ওয়্যারহাউসের মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজ রয়েছে। তার ভিতর ঢুকতে গ্যারেজের গায়ে একজোড়া জানালা দেখা গেল। একটাতেও তালা দেওয়া নেই। তা না থাকলে কী হবে, বহু বছর ধরে রঙের উপর রঙ লাগানোয় সীল হয়ে গেছে। ছুরি বের করে রঙের শুকনো স্তর চেঁছে তুলে ফেলতে হলো। তারপরও কবাট খুলতে বাহুবল দরকার হলো। জানালা গলে ভিতরে পড়ল রানা, তারপর কবাট বন্ধ করে দিল।

বড়সড় গ্যারেজটার ভিতর পেট্রোলিয়ামের ঝাঁঝাল গন্ধ। বাইরের বালব থেকে ছড়ানো আলো নোংরা জানালার শার্শির ভিতর দিয়ে খুব সামান্যই ঢুকতে পারছে। চোখে অন্ধকার সয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর কার্ডবোর্ড কার্টুন, তেলের ড্রাম, আলগা পড়ে থাকা বোর্ড ইত্যাদি পাশ কাটিয়ে এগোল। কংক্রিটের মেঝেতে গ্রীজ লেগে রয়েছে।

সামনে চকচকে রঙের উপর আবছা প্রতিফলন লক্ষ করল রানা। চোখ সরু করে তাকাল ও। তারপর পা বাড়াতে একটা গাড়ির আকৃতি ফুটল। ফেন্ডার-এর উপর একটা আঙুল রাখল রানা, সেটা তুলে বুড়ো আঙুলের সঙ্গে ঘষল। গাড়ির গায়ে কোন ধুলো জমেনি। এটা এখানে খুব বেশি দিন না চালিয়ে ফেলে রাখা হয়নি।

ড্রাইভারের দিকে চলে এসে দরজা খুলল রানা। ভিতরের আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল ইগনিশনে চাবির গোছা ঝুলছে। ব্যাপারটা রানার ভাল লাগল না। রেদোয়ান আহমেদ এতটা ভুলো মন বা অসতর্ক হতে পারেন, এটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

গাড়ির ভিতরটা ভালভাবে পরীক্ষা করে কিছুই পেল না। গ্লাভ কমপার্টমেন্টে গাড়ির মালিকের রেজিস্ট্রেশন নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু দক্ষিণ ইউরোপের একটা রোডম্যাপ, তাতে স্পেন, ইটালি আর সুইটজারল্যান্ডের রাস্তা-ঘাট দেখানো হয়েছে; আর আছে দুর্বল ব্যাটারি সহ একটা টর্চ। বোতামে চাপ দিতে সামান্য একটু নিষ্প্রভ হলদেটে আলো বেরুল।

একবার ভাবল ল্যানসিয়া জিটি-র হেডলাইট জ্বালবে। পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। টর্চের দুর্বল আলো ফেলেই গ্যারেজের ভিতরটা সার্চ শুরু করল। রাস্তার দিকে দরজায় দুটো পাল্লা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, দেখল দালানটায় আসলে কামরা রয়েছে দুটো। ওর সামনে একটা দেয়াল দেখা যাচ্ছে, তবে দেয়ালের গায়ে ফাঁকটা দিয়ে ট্রাকও ঢুকতে পারবে।

চওড়া দরজা দিয়ে দ্বিতীয় কামরায় চলে এল রানা। উল্টোদিকে, শেষ মাথায়, একটা গ্রীজ র‍্যাক দাঁড়িয়ে আছে। টর্চের ম্লান আলো আরও কমে আসছে। তারপর নিভে গেল। সেটা বার কয়েক ঝাঁকাল রানা। বৃথাই। ঘন কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এখনও সরাসরি সামনে তাকিয়ে আছে রানা, নিশ্চিত হবার চেষ্টা করছে টর্চটা নিভে যাবার আগের মুহূর্তে খাড়া করা গ্রীজ র‍্যাক-এর পাশে ও কি সত্যি

একজন মানুষকে দেখেছে? সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে ও, লোকটা নড়ছে বুঝতে পারলে টর্চ ফেলে এক ঝটকায় পিস্তল বের করবে।

ক্ষীণ আলোয় চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে আকৃতিটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। একজন মানুষই, কিন্তু আতঙ্কে বিস্ফারিত তার চোখ রানাকে কোনদিন দেখতে পাবে না।

তিনি মারা গেছেন।

হ্যাঁ, রেদোয়ান আহমেদকে চিনতে পারছে রানা। তাঁর মেলে দেওয়া হাত র‍্যাকটার উপরদিকের রেইলে আটকানো। মারা যাবার পরও চেহারায় আতঙ্ক ফুটে থাকবার কারণটা পরিষ্কার। হাতের মত তাঁর পা দুটোও বাঁধা। কংক্রিটে গাঁথা আই বোল্ট আটকে রেখেছে গোড়ালি। বেজন্মা পশুরা প্রতিবার এক সেন্টিমিটার করে হয়েস্ট তুলে আক্ষরিক অর্থেই তাঁর প্রাণ টেনে বের করে নিয়েছে।

রোমহর্ষক, মর্মান্তিক দৃশ্যটা মূর্তি বানিয়ে রাখল রানাকে। নিস্তব্ধতার ভিতর খসখস শব্দ তুলে কয়েকটা ইঁদুর উঁকিঝুঁকি মারছে। লাশটা সম্ভবত কাল থেকে ঝুলছে এখানে, তবে এখনও পচন ধরেনি। পায়ের কাছে পড়া রক্ত শুকিয়ে গেছে। রক্ত নেমেছিল পা বেয়ে, রেক্টাম থেকে বেরুবার পর। রানা ভাবতে চাইল, ছিন্নভিন্ন নারীভুঁড়ির কারণে নয়, রেদোয়ান আহমেদ মারা গেছেন স্পাইনাল কর্ড ভেঙে যাওয়ায়।

শুকনো রক্তের পাশে আধ চিবানো আর আধ পোড়া একটা চুরুট পড়ে রয়েছে। ওটা সরু আর কালো দেখেই রানা বুঝতে পারল কার।

রশি আর আঙটা খুলে আংশিক আড়ষ্ট লাশটা একটা টেবিলে নামাল রানা। ওর তেমন কিছু করবার নেই, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে শুধু একটা ফোন করে দেবে দূতাবাসে, তারপর সবকিছু তারাই করবে।

লাশের পকেটগুলো সার্চ করল রানা। গ্লাভ কমপার্টমেন্টের মত সব খালি করে রাখা হয়েছে।

যে পথ দিয়ে ঢুকেছে সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে এল রানা।

পাঁচ

অচেনা কোন লোকের কাছ থেকে পাওয়া ঠিকানাকে রানার পেশায় প্রথমে ফাঁদ বলেই ধরতে হবে। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের আগে আশপাশটা দেখে নেওয়া চাই। ন'টা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে রু হেনড্রিক্স ধরে একবার গাড়ি চালিয়ে এল রানা। এটাও একটা ল্যানসিয়া, রেন্ট-আ-কার থেকে ভাড়া করেছে। চার মিনিট পর উল্টোদিক থেকে ঢুকল রাস্তাটায়, গাড়ি চালাচ্ছে ধীরগতিতে।

বাড়িটা পুরানো, রাস্তা থেকে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। সামনের অংশটা বেশ

চওড়া, অনেকগুলো টেরেসের সমষ্টি। আশপাশের দালান-কোঠার মতই, এ বাড়িটাও চারতলা, তবে দেখতে আরও অনেক বেশি উঁচু লাগে। ছাদের উপর কালো মেঘ আর প্রায় পূর্ণচন্দ্র ঝুলে আছে।

রাস্তাটা অন্ধকার নয়। আর এত চওড়া নয় যে গেটের বাইরে বেশিক্ষণ গাড়ি রাখা যাবে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে শেড পরানো একটা করে আলো জ্বলছে।

দুই ব্লক দূরে, একটা সিনেমা হলের পাশের পার্কিং লটে ল্যানসিয়া রেখে পায়ে হেঁটে আবার ফিরে এল রানা। এবার রু হেনড্রিক্সের পিছনে, একটা সার্ভিস লেনে ঢুকল। ৮৭ নম্বর বাড়িটার পিছনে পৌঁছাবার জন্য কাঠের একটা বেড়া টপকাতে হলো ওকে। বাড়িটার ভিত তৈরি করা হয়েছে পাথর দিয়ে। গ্রাউন্ড লেভেলের জানালাগুলোকে এড়িয়ে গেল রানা। এ-ধরনের প্রাচীন বাড়ির গ্রাউন্ড লেভেল থেকে সাধারণত শুধু বেযমেন্টে পৌঁছানো যায়, আর সেটা হয় আক্ষরিক অর্থেই গোলকধাঁধা।

সিমেন্টের ধাপ পোর্চ-এর ক্ষতবিক্ষত মেঝেতে উঠে গেছে। এরপর দুটো দরজার যে-কোন একটা বেছে নিতে হবে। একটা দিয়ে কিচেনের সামনের প্যাসেজে পৌঁছানো যাবে। আরেকটার ভিতর কাঁচ মোড়া প্রায়-খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে, এক সময় সম্ভবত গার্ডেনিং অ্যালকোভ ছিল। মাটি আর সিরামিকের তৈরি প্রচুর পাত্র রয়েছে কাঠের শেলফগুলোয়।

চাপ দিয়ে একটা দরজাও খোলা গেল না। বাহুতে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা আবার বের করতে হলো। একটা জানালার শার্শির কিনারায় লাগানো পুটিনগুলো ফলার ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগল না। কাঁচ সরাবার পর ভিতরে হাত গলিয়ে পাশের দরজার ভারী একজোড়া বোল্ট খুলতে হলো। এই দরজা দিয়ে কিচেনে যাওয়া যায়। উঁকি দিয়ে দেখল মেঝেতে টাইল বসানো। ভিতরে ঢুকে কাউন্টার, চেয়ার, ওঅর্ক টেবিল ইত্যাদি এড়িয়ে আরেক দরজায় চলে এল। সামনে সার্ভিং হল আর বাটলারের প্যানট্রি। পা বাড়াতে যাবে, কানের পিছনে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল, আর তারপরই প্রাচীন একটা দেয়ালঘড়ি ঢং ঢং করে ন'টা বাজার সংকেত দিতে শুরু করল। ঘণ্টার আওয়াজ কাজে লাগিয়ে এগোচ্ছে রানা। মাত্র তিন কদম এগিয়েছে, ওর পিছনে প্যানট্রির দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না: জানালায় শার্শি না থাকায় জোরাল বাতাস ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। কে যেন আরবীতে কাকে ফোন করতে বলছে। ছুট দিল রানা, আলোকিত প্যাসেজে বেরিয়ে এসে দু'জন মানুষকে দেখতে পেল। প্রথমজন একটা রোগা মেয়ে, জোড়া কাঁচের দরজার পাশ থেকে ওয়াল ফোনের রিসিভার তুলে দ্রুত ডায়াল করছে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে তাকে। তার পাশে, রানার দিকে মুখ করে, হাতের ছড়ি মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন পক্বকেশ বৃদ্ধ। তাঁর ভেজা ভেজা চোখ থেকে আগুন ঝরছে, চেহারায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব, লড়াই করবার

জন্য এক পায়ে খাড়া। বৃদ্ধের বয়স হবে কম করেও আশি।

এখন আর ব্যাখ্যা করবার সময় নেই যে ওদের কোন ক্ষতি করতে আসেনি রানা। যে উদ্দেশে যাকেই ফোন করবার চেষ্টা হোক, প্রথম কাজ সেটা ব্যর্থ করা। একজোড়া পেটমোটা সুটকেস টপকাচ্ছে রানা, ছড়ি দিয়ে ওর কাঁধে বাড়ি মারলেন বৃদ্ধ। ছড়িটা ধরে টান দিল রানা, কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল পিছন দিকে। এই বয়সের একজন লোককে এমনিতেই আঘাত করা যায় না, তার উপর বৃদ্ধ যেভাবে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে রানার সন্দেহ হলো এক সময়ে তিনি স্ট্রোক-এ ভুগেছেন। তাঁকে এক হাতে সামলে রেখে অপর হাতটা দিয়ে মেয়েটার কাছ থেকে রিসিভার ছিনিয়ে নিল ও।

আহত চিতার মত রানাকে খামচি মারল মেয়েটা, কালো চোখে বুনো দৃষ্টি। কয়েক সেকেন্ড তিনজন মিলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচল যেন। ফোনের রিসিভার ধরা রানার হাতে ঘুসি মারছে মেয়েটা, চিৎকার করে আরবী আর ইংরেজিতে বলছে তার বড় চাচাকে রানা যেন ছেড়ে দেয়। ক্লান্ত বৃদ্ধকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বড় করে শ্বাস নিল রানা, বলল, 'থামো তুমি! আপনিও শান্ত হন!' পালা করে চাচা আর ভাইঝির দিকে তাকাচ্ছে। 'এখানে আমাকে আসতে বলা হয়েছে। মুশতাকের ওখান থেকে আসছি আমি।'

কে কার কথা শোনে। হাঁটুর নীচে একটা লাথি খেল রানা। ফোনের রিসিভার ছেড়ে দিয়ে মেয়েটাকে ধরল ও, তার হাত দুটো তারই শরীরের পাশে সাঁটিয়ে রেখে একটানে নিজের উপর টেনে আনল। বেশ খানিকটা বাতাস বেরিয়ে গেল মেয়েটার ফুসফুস থেকে। এতক্ষণে চিৎকারটা থামাল। 'এবার শোনো আমি কী বলি!' মেয়েটার কানে মুখ ঠেকিয়ে রেখেছে রানা। 'প্রথম কথা, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি।' ছোট্ট, নরম শরীরে ঢিল পড়ল। 'মুশতাক এখানে আসতে বলল আমাকে। বুঝতে পারছ? তাছাড়া, আমি ওমর খৈয়মের একজন ভক্ত।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। চোখ বড় বড় করে রানার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দ্রুত আরবীতে কী যেন বলল। চাচাও একই ভাষায় কিছু একটা বলে ছড়িটার দিকে এগোল।

'আমাকে এখন আপনি ছেড়ে দিতে পারেন,' আড়ষ্ট ইংরেজিতে রানাকে বলল মেয়েটা। টিনএজার, বয়স কোনমতেই চোদ্দোর বেশি হবে না, তবে এরই মধ্যে নারী হয়ে উঠবার সমস্ত লক্ষণ তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে। শরীরে জড়িয়ে থাকা হাত দুটো প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও সঙ্গে সঙ্গে নড়ল না সে। মুখ তুলে রানার চোখে চোখ রাখল, দু'গাল সামান্য লালচে। এক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'এই ঠিকানা তো মুশতাক আংকেল রেদোয়ান আংকেলের কাছ থেকেই পেয়েছেন। এটা তাঁর বাড়ি, অথচ আমরা এসে দেখি তাঁরই কোন হদিশ নেই। ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

কাছে এগিয়ে এসে গলা লম্বা করলেন বৃদ্ধ, রানাকে ভাল করে দেখছেন।

'তুই সব কথা বুঝবি না। মিস্টার রেদোয়ান নেই, সেজন্যেই ইনি এসেছেন,' বললেন তিনি। তারপর রানার দিকে ফিরলেন। 'আপনি অনেক দেরি করে এলেন–'

'দেরি? না। আমি বরং এক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছি।'

'অনেক দেরি করে ফেলেছেন,' বলেই চলেছেন বৃদ্ধ, যেন রানার কথা শুনতে পাননি। চেহারা দেখে মনে হলো শোকার্ত। রানা ভাবল, এখনি হয়তো শুনতে হবে যে ডক্টর দানিশ মুবারক মারা গেছেন। তারপর সন্দেহ জাগল, ভদ্রলোক ওর সঙ্গে কৌতুক করছেন না তো? উনি নিজেই হয়তো ডক্টর দানিশ মুবারক।

'সমস্যা ছিল,' গলার আওয়াজ একটু কঠিন করল রানা, 'তাই আসতে একটু দেরি হলো। এখন সময় নষ্ট না করে আসুন কাজটা আমরা সেরে ফেলি।' রানার অবশ্য পরিষ্কার ধারণা নেই কাজটা কী। 'দয়া করে বলবেন কী, ডক্টর দানিশ মুবারককে কোথায় পাব?'

মেয়েটা এগিয়ে এসে বৃদ্ধের কানে ফিসফিস করল কিছুক্ষণ। ঘষা কাঁচের মত চোখ বাঁকা করে রানার দিকে তাকাচ্ছেন বৃদ্ধ । তারপর এক সময় মেয়েটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন।

'বড় চাচা যেমন বলছেন, মিস্টার আহমেদ, আপনি আসতে অনেক দেরি করে ফেলেছেন,' বলল মেয়েটা। 'প্রফেসর দানিশ মুবারক, আমার ছোট চাচা, এখানে নেই।' হাত তুলে পেটমোটা সুটকেস দুটো দেখাল রানাকে। 'আমরাও চলে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি।'

'তোমার ছোট চাচা ফিরছেন কখন?'

মেয়েটার ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল। তারপর বড় চাচার দিকে তাকাল সে।

'বলো ওকে, রোশনি,' তাগাদা দিলেন বৃদ্ধ।

রানা খেয়াল করল, মেয়েটা কান্না দমন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

'ক্ষমা করবেন, প্লিজ,' রানাকে বললেন বৃদ্ধ। 'আমরা ইরাকিরা একান্নবর্তী পরিবারে থাকি, তাই ইমোশন একটু বেশি। আমার নাম আহসান, আহসানুল মুবারক। ডক্টর দানিশ মুবারক আমার মেজো ভাই। আমাদের ছোট ভাই রোশনিকে রেখে মারা গেছেন। তাই দানিশ যখন বললেন যে এরপর চিকিৎসার জন্যে বাইরে গেলে তিনি আর দেশে ফিরবেন না, তখন আমরাও ভাবতে বসলাম কীভাবে দেশ ত্যাগ করে কোথায় যাওয়া যায়...'

পারিবারিক ইতিহাস শুনবার সময় বা ধৈর্য কোনটাই নেই রানার। ভাবছে, একজনকে নিতে এসে এখন দেখা যাচ্ছে গোটা ফ্যামিলি হাজির! বলল, 'আপনাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। হয়তো রেদোয়ান সাহেব জানতেন, কিন্তু মৃত্যুর আগে জানিয়ে যেতে পারেননি। চিন্তা করবেন না, আমার সাধ্যমত সবই করব আমি আপনাদের জন্য। তবে এ-মুহূর্তে আমি যে কাজে এসেছি সেটা আমাকে শেষ করতে হবে,' বলল ও। 'আচ্ছা, প্রফেসর দানিশ কি দশটার মধ্যে

ফিরবেন?'

বৃদ্ধ আহসান রোশনির দিকে তাকিয়ে আছেন। 'আপনি বুঝতে পারছেন না,' বললেন তিনি, আবার তাকালেন রানার দিকে। 'তিনি আজ দু'দিন হলো চলে গেছেন। এখানে আর ফিরবেন না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করল রোশনি। 'প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম উনি কাজ করছেন। টেস্ট টিউব আর এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে যখন ব্যস্ত থাকেন, সময় সম্পর্কে ছোট চাচার কোন হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। কিন্তু এবার তাঁকে এমনকী জাঁ পলও দেখেনি।'

'পল কে?'

'রিটায়ার্ড ড্রাগিস্ট। ল্যাবরেটরি আছে, আমার ধারণা মেডিকেল টেস্ট অ্যানালাইজ করেন। ছোট চাচা প্রায়ই যেতেন ওখানে। এখানে বন্দি হয়ে থাকতে পছন্দ করতেন না। আমারও ভাল্লাগে না।'

চারদিকে চোখ বুলিয়ে রানা দেখল পুরানো ওয়ালপেপারে নোংরা দাগ লেগে রয়েছে। জানালার পর্দাগুলোর রঙ উঠে গেছে। হালকা ফার্নিচার প্রায় সবগুলোই ভাঙাচোরা। এটা একটা পরিত্যক্ত বাড়ি, বহুকাল কেউ বসবাস করেনি। রেদোয়ান এটা সম্ভবত কোন এজেন্সির মাধ্যমে ভাড়া করেছিলেন সেফ হাউস হিসাবে কাজে লাগাবার জন্য। এরকম আরও একটা সেফ হাউস আছে, কিন্তু এখন বোধহয় জানবার উপায় নেই কোথায় সেটা। ডক্টর দানিশ সেখানে গা ঢাকা দিয়ে নেই তো?

'এরকম আগেও তিনি বাইরে থেকেছেন?'

'এখানে আমরা লুকাবার পর দু'বার। প্রথমবার জেনেভায় গিয়েছিলেন, মেডিকেল ক্লিনিকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আবার যাবার সময় হয়নি। যাবেন আরও এক মাস পর।'

'তিনি কি এতই অসুস্থ যে নিয়মিত চেক-আপ করাতে যেতে হয়?'

'হ্যাঁ। বেশ কিছু দিন ধরে...বোধহয় তিন বছর...নিয়মিত সুইটজারল্যান্ড যেতে হচ্ছে তাঁকে।'

'মুশতাক তাহলে এখানে আমাকে আসতে বলল কেন? সে কি জানে না ডক্টর দানিশ চলে গেছেন?'

'তিনি আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন, কারণ তিনি জানেন যে এখানে আপনার কাজ আছে,' বলল মেয়েটা।

'এমন কি হতে পারে, ডক্টর দানিশ আবার জেনেভাতেই গেছেন?'

'ব্যাগ বা সুটকেস ছাড়াই?' পাল্টা প্রশ্ন করল রোশনি।

'গেছেন কিনা নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই? হসপিটালে ফোন করা যায় না?'

'যায়, যদিও হসপিটালটা কোথায় বা কী নাম তা আমি জানি না। ছোট চাচার ডাক্তার ভদ্রলোক একমাত্র আমার সঙ্গে কথা বলবেন, এরকমই সিদ্ধান্ত নেয়া

হয়েছে। কিন্তু ফোন নম্বরটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

এই সময় হঠাৎ বৃদ্ধ আহসান অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন। হাতের ছড়িটা মেয়েটার দিকে তাক করে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কী যেন বললেন, বিন্দু বিসর্গ কিছুই রানা বুঝতে পারল না। পাঁচ-সাত সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল রোশনি, ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। ছড়িটা এবার রানার দিকে তাক করলেন আহসান, ইঙ্গিতে লিভিংরুমে ঢুকতে বলছেন ওকে।

রানা ইতস্তত করছে। বৃদ্ধ যখন রোশনিকে উপরে উঠে যাবার নির্দেশ দিলেন, ওর ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করছিল। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, বুড়ো আহসান আর রোশনি মুখস্থ করা সংলাপ আওড়ে গেছে ওকে এখানে আটকে রাখবার জন্য। ধুত! কী সব ভাবছে!

বৃদ্ধ আহসান ছড়ি তুলে লিভিংরুমের দরজাটা দেখালেন। 'প্লিজ।'

সাবধানে চৌকাঠ পেরিয়ে বড়সড় কামরায় ঢুকল রানা।

'আপনার জবাব যদি "না" হয়, আমি চাই না রোশনি সেটা শুনতে পাক,' বড় মুবারকের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর কোন রকমে শুনতে পাচ্ছে রানা। লক্ষ করল, ভদ্রলোকের হাত দুটোও মাঝে মধ্যে থরথর করে কেঁপে ওঠে। 'আপনি কি আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছেন?'

তাঁর প্রশ্ন থেকে পেটমোটা সুটকেস দুটোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা অসহায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধর জন্য মনটা ভিজে গেল রানার। তবে মিথ্যে আশ্বাসই বা দেয় কী করে! বলল, 'দেখুন, আমি নিজেই রয়েছি মহা বিপদের মধ্যে। আগেই বলেছি, আপনাদের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই আমার। তবে আমি জায়গা মত মেসেজ পাঠিয়ে দিলে কেউ একজন এসে আপনাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে নিরাপদ কোথাও। আমাকে পাঠানো হয়েছে ডক্টর দানিশকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

'ডক্টর দানিশ আপনাদেরকে দেয়ার জন্যে একটা জিনিস রেখে গেছেন,' বললেন আহসান। 'এটা তাঁর তরফ থেকে আপনাদেরকে একটা গিফট। জিনিসটা ওয়াইন সেলারে আছে।'

'কোন কাগজ নয়? টেপ বা সিডি নয়? ডকুমেন্ট নয়?'

'শুধু একটা বোতল।'

'কিসের বোতল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এটা কি তিনি ইরাক থেকে নিয়ে এসেছেন?'

'না।' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ আহসান। 'এটা তিনি এক রাতে জাঁ পলের ল্যাবে কাজ শেষে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। বোতলটায় কিছু একটা আছে, তবে কী জিনিস তা আমি জানি না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি সেলারের চাবিটা প্যানট্রি থেকে নিয়ে আসি।'

তাঁর পিছু নিয়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এল রানা। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে সিঁড়ির দিকে তাকাল ও। প্রথম ল্যান্ডিঙের কাছাকাছি একটা

ধাপে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে রোশনি, চোখে পলক না ফেলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চোখাচোখি হতে হাসল না, নীচের ঠোঁটের একটা কোণ কামড়ে ধরে কী যেন চিন্তা করছে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ছোট চাচার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবেন?'

প্রশ্নটা নিয়ে রানাও মাথা ঘামাচ্ছে। কন্ট্যাক্ট-এর জন্য সময় ঠিক করা হয়েছে আজ রাত দশটায়। দশটা বাজতে এখনও আধঘণ্টা বাকি। এই আধঘণ্টার মধ্যে ডক্টর দানিশ এখানে হাজির হবেন, এরকম আশা করবার কোন কারণ নেই। 'এখানকার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে অন্য এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে,' সত্যি কথাই বলল রানা। ও আশা করছে, দশটা বাজবার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, আড়াল থেকে লক্ষ রাখবে বাড়িটার উপর। 'তবে টেলিফোনে খোঁজ নেব উনি ফিরলেন কি না।'

'সেটা হবে বৃথা সময় নষ্ট। আমার মনে হয় না ছোট চাচা আর ফিরবেন।'

'কী করে বুঝলে?'

'আড়াল থেকে ওঁদের দুই ভাইকে কথা বলতে শুনি যে। ছোট চাচার ভয়, তাঁকে ধরার জন্যে যে বৃত্তটা তৈরি করা হয়েছে সেটা ছোট হয়ে আসছে। তিনি পালিয়েছেন কেন জানেন? কিছুটা নিজের প্রাণ হারাবার ভয়ে, কিছুটা আমাদেরকে যেদিক দু'চোখ যায় সেদিকে পালাবার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে। আজ রাতে সেটাই করব আমরা–আমি আর বড় চাচা। কিন্তু বেচারা ছোট চাচা হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারবেন না। এমনিতেই বুড়ো মানুষ, অসুস্থ, তার ওপর টেস্ট টিউব আর বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া দুনিয়ার প্রায় সমস্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ।'

'এই বয়সে এত কিছু তুমি জানলে কীভাবে?'

'আমাকে আপনি ছোট ভাববেন না। ছোট চাচা ইরাক থেকে বেরুতে চান, এই খবরটা মিশরীয়রা গোপন রাখতে পারেনি।'

বড় চাচা আহসানের কর্কশ কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল রোশনিকে। 'দোতলায় তোমার না আরেকটা সুটকেস গোছানোর কথা?'

ঠোঁট ফুলিয়ে সিধে হলো রোশনি, ঘুরল, তারপর ধাপ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আসুন। বোতলটা নিয়ে দয়া করে চলে যান আপনি।' ঘুরে হাঁটা ধরলেন আহসান।

তাঁর পিছু নিল রানা, কিচেন হয়ে বেযমেন্টের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তালায় পুরানো আমলের একটা ব্রোঞ্জ কী ঢোকালেন আহসান। সিঁড়ি বেয়ে একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ উঠে আসছে। দরজার পাশের সুইচ অন করতে আলোকিত হলো শুধু ধাপগুলো, নীচের অন্ধকার দূর হলো না। 'মাথা সামলে,' বললেন আহসান, ছড়ি দিয়ে নিচু সিলিঙে বাড়ি মারলেন একটা।

দ্বিতীয় সুইচটা সিঁড়ির নীচে, অন করতে ব্যবধান রেখে তিনটে বালব জ্বলে উঠল। সেগুলোর আলো স্যাঁতসেঁতে সেলারের গাঢ় ছায়াগুলোকে কোন রকমে

পিছু হঠাতে পারছে।

একজোড়া স্টোরেজ অ্যালকোভকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। ইঁট দিয়ে গাঁথা খিলানের নীচ দিয়ে বড়সড় একটা কামরায় ঢুকে দেখল দু'পাশে ছ'টা ওয়াইন র‍্যাক দাঁড়িয়ে আছে, কামরার মাঝখানে তৈরি হয়েছে চওড়া আইল বা প্যাসেজ। এখানে মোচাকৃতি মেটাল রিফ্লেক্টর-এর নীচে নিঃসঙ্গ একটা বালব জ্বলছে, ম্লান আলোর একটা বৃত্ত পড়েছে বাদামী মেঝেতে। র‍্যাকগুলোর মাথা প্রায় সিলিং ছুঁয়েছে। দ্রুত একটা হিসাব কষে রানা ধারণা করল, খাড়া করা বিনগুলোয় কম করেও দু'হাজার বোতল ধরবে। র‍্যাকগুলো সব মুখোমুখি দাঁড় করানো। যে জোড়াটা আহসান বাছাই করলেন, সে দুটোর মাঝখানে দু'জন দাঁড়াবার মত যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।

'ওপরে উঠতে হবে,' গিঁটবহুল আঙুল তুলে সিলিঙের দিকটা দেখালেন আহসান। 'ভাল হয় আপনি যদি একটা স্টেপ স্টুল টেনে আনেন।'

দেয়ালের কাছ থেকে ধাপ লাগানো, উঁচু একটা টুল নিয়ে এসে জায়গা মত রাখল রানা। উপরে উঠবার পর সবগুলো বোতল ওর নাগালের মধ্যে চলে এল। শুধু তাই নয়, বোতলের লেভেলগুলোও পড়তে পারছে। কোন কোন বোতল পঞ্চাশ বছরের পুরানো দেখে বিস্মিত হলো ও। সবগুলো লেভেল পড়বার সুযোগ পাওয়া গেল না, নীচ থেকে অসহিষ্ণু আহসান একটা বোতলের দিকে ছড়ি তাক করে বললেন, 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!'

তাঁর দেখানো বোতলটা হাতে নিল রানা। একমাত্র এই একটা বোতলেই ধুলো বা মাকড়সার জাল নেই। গাঢ় রঙের কাঁচ একটু যেন পিচ্ছিল। গায়ে কোন লেবেল নেই। 'দিন। আমাকে দিন ওটা,' বললেন আহসান।

বোতলটা রানা বাড়িয়ে ধরল। জরাগ্রস্ত চামড়ায় মোড়া আহসানের হাত রানার হাতের উপর পড়ল। রানা অনুভব করল বোতলের গলা তাঁর মুঠোর ভিতর চলে গেছে। তখনও নিজের হাত বোতল থেকে সরিয়ে নেয়নি ও, এই সময় বেযমেন্টের সিঁড়ির দিক থেকে কিছু একটা ঘষা খাওয়ার কর্কশ আওয়াজ ভেসে এল।

'রোশনি!' গলা চড়িয়ে ডাকল রানা, আলো ছাড়িয়ে অন্ধকারে ছুটে গেল ওর দৃষ্টি।

কেউ সাড়া দিল না, তবে একটা চিৎকার শোনা গেল। ভারী পায়ের শব্দ রানার দিকে ছুটে আসছে। তারপর কাঁচ ভেঙে পড়বার আওয়াজ হলো। কামরার সরাসরি উল্টোদিকে, বেযমেন্টের জানালাটা বিস্ফোরিত হয়েছে।

ছয়

একটা গুলি হলো। গুলি তো নয়, বদ্ধ জায়গায় যেন একটা ১২০ মিলিমিটার কামান গর্জে উঠল। বুলেট ছুটে গেল রানার কপালের পাশ দিয়ে। উঁচু টুল থেকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে ও, বৃদ্ধ আহসানকে সঙ্গে নিয়ে।

মেঝেতে হুড়মুড় করে পড়বার সময় গুলির মত আরেকটা শব্দ শুনল রানা। গুলি নয়, ওটা আসলে সেই ওয়াইনের বোতলটা, বিস্ফোরিত হয়েছে কংক্রিটের মেঝেতে বাড়ি খেয়ে। বোতলের বেশ খানিকটা তরল পদার্থ ওর কাপড়চোপড়ে ছিটকে এসে লাগল। দু'জনেই খানিকটা গড়িয়েছে। এই মুহূর্তে পাথুরে দেয়ালের কাছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রানা, হাড়সর্বস্ব আহসান ওর গায়ে কিম্ভূতকিমাকার বোঝার মত চেপে আছেন।

নিজেকে মুক্ত করবার জন্য বৃদ্ধকে ঠেলে সরিয়ে দিল রানা। বিনা প্রতিবাদে নেমে গেলেন তিনি, নামবার পর একটুও নড়াচড়া করলেন না। মাথাটা যেভাবে নড়বড় করে উঠল, খুলিটা বোধহয় দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খাওয়ায় জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত।

হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার। এটাই ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া। প্রথম অ্যাকশনে গুলি করল কাছাকাছি সিলিঙের বালবটাকে লক্ষ্য করে। বুলেটটা মেটাল রিফ্লেক্টরে ঘষা খেলো, ফলে একদিকে একটু কাত হয়ে গেল সেটা। চোখের পলক ফেলতে যে সময় লাগে, আলোটা সরে গিয়ে সেইটুকু সময় মাহমুদ, মুশতাক আর রেদোয়ানের খুনীর মুখে লেগে থাকল। রানার পরবর্তী বুলেটে গুঁড়ো হয়ে গেল বালবটা।

চারপাশে অন্ধকার পেয়ে রানা খুশি। ওর প্রতিপক্ষ সংখ্যায় ক'জন বোঝা যাচ্ছে না, তবে তাদের পিছনে আলো আছে–আড়াল থেকে বেরুলে টার্গেট করতে পারবে ও।

নজর তীক্ষ্ণ করে তাকাবার পর, কিছুক্ষণের মধ্যেই, সামনের ওয়াইন র‍্যাকের পিছনে দুজনকে গুড়ি মেরে বসে থাকতে দেখল রানা। সাজানো বোতল সহ মৌচাকের মত দেখতে র‍্যাকটা। লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টানল রানা। গুঙিয়ে উঠল একজন, তবে মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনেই। এবার রানা সুযোগ পেল নিজের দু'পাশে তাকাবার।

বন করে নব্বুই ডিগ্রি ঘুরে জানালার দিকে তাকাল রানা। প্রথম গুলিটা ওদিক থেকেই এসেছে। ঢাউস একটা পিস্তলের পিছনে কালো একটা মূর্তি মাথা তুলছে। দ্রুত ট্রিগার টেনে দুটো গুলি করল ও। বুলেটগুলো তার মুখের পাশে দেয়ালে গিয়ে লাগল। লোকটাকে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কাত হতে দেখল ও। পাথরের

ছিলকা গ্রেনেডের উড়ন্ত টুকরোর মত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তার হাতের ভারী অটোমেটিক জানালার ভিতর দিকে খসে পড়ল, কংক্রিটের মেঝেতে আওয়াজ হলো ঠকাস করে।

নীরবতা দীর্ঘ হচ্ছে সেলারের ভিতর। বৃদ্ধ আহসানের কষ্ট করে শ্বাস টানার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। সামনের ওয়াইন র‍্যাকের পিছন দিকে অস্পষ্ট একটা আকৃতিকে নড়তে দেখেছে বলে সন্দেহ হলো। তারপরই পায়ের আওয়াজ, দূরে সরে যাচ্ছে। একটা পা তাড়াতাড়ি পড়ছে, আরেকটা তাল মেলাতে পারছে না, একটু ঘষাও খাচ্ছে মেঝেতে। একজনকে জখম করা গেছে–পায়ে বা উরুতে। রোশনির নিরাপত্তার কথাটা ঠিকই মাথায় আছে, তবে জানে এখনই ওর কিছু করবার নেই।

'এসো, আলাপ করি।' একদম শান্ত একটা কণ্ঠস্বর, যেন গলার অনেক গভীর থেকে উঠে এল, ভাষাটা ইংরেজি।

রানা সাড়া দেবে না। লোকটা হয় বোকা, নয়তো প্রচণ্ড সাহসী। গলার ওই আওয়াজ লক্ষ্য করে গুলি করতে পারে রানা–এই দূরত্বে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম–দু'একটা দাঁতকে সঙ্গে নিয়ে মগজ হয়ে বেরিয়ে যাবে বুলেটটা।

'তোমার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই, বন্ধু,' ছায়ার ভিতর থেকে আবার ভেসে এল আওয়াজটা। 'তুমি শুনছ তো, মিস্টার রানা?'

দেয়ালের আরও কাছে সরে এসে, অচেতন আহসানের পাশে একটু কাত হলো রানা। ওর খালি হাত ভাঙা বোতলের চামচ আকৃতির একটা টুকরোর সঙ্গে ঘষা খেল। আঙুলে একটু ঘন, আঠাল তরল পদার্থ লেগে গেল।

'তোমার কিন্তু নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার কোন দরকার নেই।' কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। 'আমরা প্রফেসর দানিশকে নিতে এসেছি। উনি তোমার সঙ্গে রয়েছেন, তাই না?'

অচলাবস্থার কারণটা পরিষ্কার হলো। ঠাণ্ডা মাথার লোকটা রানার স্বার্থ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়, জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় ইরাকি বিজ্ঞানী ডক্টর দানিশকে দরকার তার। কাতর, ব্যাকুল একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল সিঁড়ির দিক থেকে। সাড়া দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করল আরবিটার।

'শোনো, বন্ধু,' আবার রানাকে বলল সে। 'আলোগুলো এখন নিভিয়ে দেবে গেহার্ড। কথা দিচ্ছি, অন্ধকারে কেউ আমরা তোমার দিকে এগোব না। এটা করা হচ্ছে, আমি যাতে তোমার সঙ্গে ইকুয়াল টার্মে কথা বলতে পারি। তুমিও কিন্তু হঠাৎ কিছু করে বোসো না।'

চোখ বুজল রানা, জানে লোকটা ওর মতামতের জন্য অপেক্ষা করবে না। গেহার্ডকে নির্দেশ দিল সে। আলোর সুইচ থেকে ক্লিক করে আওয়াজ হতেই চোখ খুলল রানা। অন্ধকারের সঙ্গে আগেই অভ্যস্ত হয়ে নেওয়ায় সুবিধে হয়েছে। ওয়াইন র‍্যাক-এর তৈরি প্যাসেজের শেষ মাথায় চোখ কাত করে দেখছে কিছু নড়ে কিনা।

'এবার, বন্ধু, ডক্টর দানিশকে কথা বলবার অনুমতি দাও।'

'আমার সঙ্গে ইনি আহসান,' ঝুঁকি নিয়ে বলল রানা।

'আহসানুল মুবারক? বেশ, বড় ভাইকে মুখ খুলে নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করতে দাও।'

'কী করে মুখ খুলবেন? তাঁর জ্ঞান নেই। সম্ভবত মারা যাচ্ছেন।'

'আর প্রফেসর? তাঁর কী অবস্থা?'

'তাঁর অবস্থা জানার আগে নিজের অবস্থার খবর নিলে ভাল করবে, আরবিটার।'

'হোয়াট!' খুনিটা বিস্মিত। 'এর মানে?'

'একের পর এক খুনগুলো কে করছে, ফ্রেঞ্চ পুলিশ তা জানে,' বলল রানা। 'তারা জার্মান-ইহুদি সেডরিক থান্ডার ওরফে আরবিটারকে দায়ী করছে।'

'ফ্রেঞ্চ পুলিশ আমার ছায়াও মাড়াতে পারবে না। তুমি অনধিকার চর্চা করছ। তোমার সঙ্গে আমার আলাপের বিষয় একটাই—ডক্টর দানিশ। কোথায় তিনি?'

'সত্যি, কোথায়?'

'তারমানে কি তুমিও জানো না?'

'আরে গর্দভ,' একটু হাসল রানা। 'জানলে কি এখানে আমি বসে থাকি?'

আরবিটার কী ভাবছে আন্দাজ করতে পারল রানা। তার সম্ভবত ধারণা ডক্টর দানিশের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে যা জানবার ছিল জেনে নিয়েছে ও, তারপর তাঁকে নিরাপদ কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে তথ্য পাচারের সুযোগ দিয়ে এখানে রানাকে ফেলে রেখে যাবে না সে। ভবিষ্যতে সফল হবার জন্য এই মুহূর্তে যা কিছু করা দরকার সবই সে করবে—ট্রফিটা যদি শুধু সাধারণ একটা বাঙালী খুলি হয়, তা-ও।

শান্তিময় সহাবস্থানের পরিসমাপ্তি ঘটল খুনিটা তার আহত সঙ্গীকে পাশে চলে আসতে বলায়। পা টেনে টেনে হাঁটার আওয়াজটাকে নিজের নড়াচড়া গোপন করবার কাজে ব্যবহার করল রানা, চলে এল ওয়াইন র‍্যাক ব্যারিয়ারের খোলা প্রান্তে। প্রায় পৌঁছে গেছে, নিতম্বে ঘষা খেল র‍্যাকটা। ওটা নড়বে কেন? আসলে কাত হচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ভারী র‍্যাকটা ফেলে ওকে চ্যাপ্টা করবার কাজে আরবিটারকে সাহায্য করছে গেহার্ড।

শরীরে বিদ্যুৎ খেলল। হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরি। আন্দাজ করে বিদ্যুদ্বেগে আঘাত হানল রানা। ওয়াইন র‍্যাকের পাশেই ছিল ওর টার্গেট। মাংসের ভিতর ফলার ডুব দেওয়াটা অনুভব করতে পারল ও। দ্রুত বাতাস টানার শব্দ হলো।

আরেকটা আবছা আকৃতি, ব্যথা আর পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে, টলমলে ওয়াইন র‍্যাকের গায়ে সেঁটে আছে। একটু পিছাল রানা, তারপর শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে উল্টোদিকে কাত করল র‍্যাকটাকে।

সাহায্য ছাড়া র‍্যাকটার পতন ঠেকানো গেহার্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার জন্য ছুটল সে, রানা তার আঁতকে উঠবার আওয়াজ শুনল।

র‍্যাকটা পড়ল পিছনের আরেকটার উপর। তারপর ভূমিকম্পের মত সব কিছু কাঁপিয়ে দিয়ে আর কান ফাটানো শব্দ করে দুটোই পড়ে গেল মেঝেতে। আহত গেহার্ড এবার আর্তনাদ করে উঠল। ফড়ফড় করে পরনের কাপড় ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করছে সে। রানার মুখের ভিতর ধুলো ঢুকেছে। শরীরে ছিটকে এসে পড়েছে ভাঙা বোতলের অসংখ্য টুকরো। সেলারের ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ।

সেলারের মেঝে ধরে ভাঙা বেযমেন্ট জানালার নীচে এসে দাঁড়াল রানা। এক মিনিটও পার হয়নি, রাস্তায় একটা গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ ভেসে এল। দ্রুত মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

'আরও জোরে!' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সেডরিক থান্ডার। রক্ত বন্ধ করবার জন্য পাঁজরের ক্ষতটায় এক হাত চেপে রেখেছে। তার এখন একটাই চিন্তা, যত দ্রুত সম্ভব আন্ডারগ্রাউন্ডের একজন সার্জেনের কাছে পৌঁছাতে হবে। ক্ষতটা খুব গভীর না হলেও রক্ত পড়ছে এখনও।

ড্রাইভার স্পীড বাড়াচ্ছে, প্রতিটি বাঁকে পিছলে যাচ্ছে গাড়ির চাকা।

কিরিরির! কিরিরির!

মোবাইল ফোন বের করবার সময় চেহারা কুঁচকে কাতরে উঠল থান্ডার। 'বাপরে!' সুইচ অন করল ফোনের। 'হ্যালো?'

'হের থান্ডার?'

'বলছি।' দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে থান্ডার।

'আমি কার্ল, হের থান্ডার।'

'তুই শালা কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠল থান্ডার।

'জ্বী? হের থান্ডার? জ্বী, ডাভোসে।'

'ডাভোসে? ডাভোসে কি মরতে গেছিস?'

'হের থান্ডার,' কার্লের কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা, 'আমরা ডক্টর মুবারককে খুঁজে পেয়েছি।'

'হোয়াট!' কথাটা শোনা মাত্র দম বন্ধ হয়ে এল থান্ডারের। 'আরেকবার বল?'

'হের থান্ডার, আমরা ডক্টর মুবারককে পেয়েছি।'

'তোমার বেতন বেড়ে গেল, বাছা। কোথায়?'

'জেনেভাতেই। কার্লস্ট্রাসের একটা হাসপাতালে...'

'তোমাদের আর কিচ্ছু করতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলল থান্ডার। 'আমি আসছি।'

'হের থান্ডার,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল কার্ল, 'আপনার অনুমতি না নিয়েই তাড়াহুড়োয় আমরা একটা বেয়াদবি করে ফেলেছি...'

'কী করেছিস?' ঘন ভুরু কুঁচকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল চেহারাটা।

'হের থান্ডার, বিজ্ঞানীকে আমরা কিডন্যাপ করে ডাভোসে নিয়ে চলে

এসেছি।'

'তাই নাকি? বাহ্! কাজের কাজই তো করেছ। ডাভোসে মানে আমাদের আস্তানায় তো?'

'জ্বী, হের থান্ডার। পালাবার সময় অ্যাক্সিডেন্ট করি আমরা, দু'জন সামান্য আহত হয়েছি।'

'ঠিক আছে। মোটা বকসিসও পাওনা হয়েছে তোমার। আমি আসছি। রাখলাম।'

যোগাযোগ কেটে দিল থান্ডার। ভুলে গেছে জখমের কথা। ড্রাইভারকে বলল, 'এই, গাড়ি ঘোরাও! আগে ডাভোসে চলো।'

গভীর নিস্তব্ধতা যেন জেঁকে বসছে। উপরতলায় উঠে কী দেখতে হবে ভেবে ভয় পাচ্ছে রানা।

লাইটার জ্বেলে আহসানকে পরীক্ষা করল ও। চোখ বন্ধ, তবে এখনও নিঃশ্বাস ফেলছেন। বুকের ওঠা-নামা এত ক্ষীণ যে সহজে চোখে ধরা পড়ে না। তাঁকে ওখানে রেখেই সিঁড়ি বেয়ে সেলার থেকে উঠে এল রানা। আলোগুলো জ্বেলে দিয়েছে, দরজাটাও বন্ধ করেনি।

'রোশনি! রোশনি!' এক কামরা থেকে আরেক কামরায় চলে আসছে রানা। ডাইনিংরুমে পাওয়া গেল তাকে, মুখে কাপড় গুঁজে একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। শার্টটা ছেঁড়া, একদিকের কাঁধ থেকে ঝুলছে। কেউ ঘুসি মারায় বাম চোখের নীচে ফর্সা চামড়া নীলচে হয়ে গেছে।

রানার প্রশ্নের জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, ঠিক আছে সে। তার মুখ থেকে নোংরা ন্যাকড়াটা বের করে নিল রানা। তারপর পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটোও মুক্ত করল। ফুঁপিয়ে উঠে কী যেন জানতে চাইল রোশনি, জবাব না দিয়ে পায়ের বাঁধনটা খুলছে রানা। তারপর বলল, 'আমাকে তোমার বড় চাচার কাছে যেতে হচ্ছে। সেলারের মাঝখানে নতুন একটা বালব লাগবে–কোথায় আছে জানলে নিয়ে এসো।'

বৃদ্ধ আহসানের মাথাটা রানার কোলের উপর, নিঃশব্দে মারা গেলেন তিনি।

রোশনি ভেজা তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল, তোয়ালে আর পানির পাত্র ফেলে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

ভাঙা বোতলের অবশিষ্ট বড় টুকরোটা নিজের কোলের উপর একহাতে ধরে রেখেছিলেন আহসান, মৃত্যুর সময়ও সেটা ছাড়েননি। বোতলের ঘন আঠালো পদার্থ কিছুটা তাঁর ট্রাউজারে পড়েছে। রানার জানামতে পৃথিবীতে এমন ওয়াইন কোথাও তৈরি করা হয় না যা চিনির ঘন সিরাপের মত, আর রঙ দেখে মনে হয় ব্যবহার করা মোটর অয়েল। ওর নিজের হাতেও খানিকটা লেগেছে। কথাটা মনে পড়ল অনায়াসেই, কারণ জিনিসটা আঙুলের ডগায় যেখানে এখনও একটু লেগে

আছে সেখানে অল্প জ্বালা-পোড়া অনুভব করল ও। কাপড়ে লেগেছিল, তা থেকে চামড়া ছুঁয়েছে, এখন সে সব জায়গাও ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। জিনিসটায় বোধহয় ক্ষার আছে, চামড়ার জন্য ক্ষতিকর।

খানিকটা গাঢ় তরল পদার্থ পড়ে রয়েছে মেঝেতে, সেটা থেকে ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো তুলে নাকের সামনে ধরল রানা। সামান্য দুর্গন্ধ আর ঝাঁঝ আছে, কিছুটা যেন হাইড্রোজেন সালফাইড-এর সঙ্গে মেলে। আর যাই হোক, জিনিসটা অবশ্যই ওয়াইন নয়।

কিচেন সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে ট্যাপ ঘোরাল রানা, পানিতে হাত ভেজাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পর হাত টেনে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আঙুলের ডগা লাল হয়ে উঠেছে। সামান্য একটু বমি-বমি ভাব আছে। এটা সাইকোলজিকাল প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, ভাবল রানা; হয়তো স্রেফ কল্পনা।

রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার প্রধান সুরভি ইসলামকে বাড়ির ফোনে পাওয়া গেল না। তবে রানাকে বলা হলো, সুরভি তার ভাইয়ের লাশ দেশে পাঠাবার কাজে দূতাবাসে খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। দূতাবাসে ফোন করে সুরভির সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা, আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে বলল, আমার কিছু করবার থাকলে বলো। সুরভি ধন্যবাদ দিল, তারপর বলল, সবাই জানত বড়দা বেঁচে নেই–লাশটা বরং স্বস্তি এনে দিয়েছে। রানা বলল, এবার জরুরী একটা কাজ। পারবে? সুরভি জবাব দিল, শোক ভোলার জন্য একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারলে মন্দ হয় না। রানা তাকে ঠিকানা দিয়ে সংক্ষেপে বলল, কাল সকালের মধ্যে আরেক ভদ্রলোককে কবর দিতে হবে, আর একটা মেয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বও নিতে হবে। ঢাকা থেকে প্যারিসের সময়ের পার্থক্য যেন কত? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে–পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে প্যারিস। তারমানে ঢাকায় এখন ভোর চারটে বাজে।

মাত্র দু'বার রিঙ হতেই অপরপ্রান্তে রিসিভার তুললেন রাহাত খান। গলার আওয়াজ যান্ত্রিক আর ঘর্ঘরে, কোন রকমে শুনতে পাচ্ছে রানা।

'রাহাত খান স্পিকিং।'

'রানা, সার।'

'এসময়?' কণ্ঠস্বরে শুধু খানিকটা বিস্ময়, বস্ বিরক্তি প্রকাশ করছেন না।

'সার, আপনি কি জানতেন ডক্টর মোবারক আমাদেরকে কিছু দিতে চেয়েছিলেন? তরল কিছু...একটা বোতলে?'

'হুঁম্-ম্-ম, হতে পারে।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন রাহাত খান। 'তাও সম্ভব বৈকি। কিন্তু আবিষ্কার বা ফর্মুলা তো পরের কথা, প্রথম গুরুত্ব ডক্টর দানিশ মুবারকের। তিনি কোথায়?'

'তিনি নেই, সার–'

এই সময় ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আবার ডায়াল করল রানা, কিন্তু কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে না।

বারকয়েক চেষ্টা করবার পর টেলিফোন বিভাগের অপারেশনাল সেকশনের নাম্বার ডায়াল করল রানা। ওর অভিযোগ শুনে অপারেটর জানাল: 'দূরপাল্লার কল-এর ফ্রিকোয়েন্সি ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। দায়ী সৌর ঝড়। কিছুক্ষণ পর আবার চেষ্টা করুন।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আঙুলের গিঁটগুলো পরীক্ষা করল রানা। ওগুলো সাদা হয়ে গেছে।

বারবার চেষ্টা করছে রানা। সাত মিনিট পর আবার যোগাযোগ হলো, রাহাত খান জানতে চাইলেন: 'আমার কথা তুমি ঠিক মত শুনতে পাচ্ছ, রানা?'

'পাচ্ছি, সার। আমি পৌঁছবার আগেই জায়গা থেকে সরে গেছেন ডক্টর মুবারক। একটা বোতলে কিছুটা তরল জিনিস রেখে গিয়েছেন নমুনা হিসেবে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি, সার। কিন্তু ওয়াইন সেলারে গোলাগুলির সময়ে ওটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেছে। আপনার কোনও ধারণা আছে, সার, জিনিসটা কি প্রাণী বা গাছপালার কোন ক্ষতি করবে?'

অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে মনে হলো, অন্য একটা টেলিফোনে কারও সঙ্গে পরামর্শ করলেন রাহাত খান, তারপর বললেন, 'না। তোমার গায়ে কিছুটা লেগেছে বুঝি? ভয় পেয়ো না। আচ্ছা, নমুনাটা এ-মুহূর্তে ঠিক কী কন্ডিশনে রয়েছে বলো তো? খানিকটা উদ্ধার করা যাবে না?'

'মনে হয় যাবে, সার।'

'নমুনাটা আমাদের দরকার,' রানা। ভ্যাকিউম কন্টেইনারে রাখতে পারলে ঠিক থাকত। কতক্ষণ আগে ভেঙেছে বোতল?'

'মিনিট বিশেকের বেশি হবে না।'

আবার একটা দীর্ঘ বিরতি। লাইনে ফিরে আসবার পর এবার হতাশ মনে হলো রাহাত খানকে। 'ওটার কথা আমাদের বোধহয় ভুলে যাওয়াই ভাল, রানা। জিনিসটা বাতাসে উবে যায়, নরমাল অ্যাটমোসফিয়ারিক কন্ডিশনে এক্সপোজ করা হলে গুণ হারাতে থাকে। কাজেই, জিনিসটা আসলে পেয়েও আমরা হারিয়েছি।'

'আপনি তখন বললেন খানিকটা উদ্ধার করা...'

'উদ্ধার করা সম্ভব শুধু যদি ওটা পুরোপুরি ডিকমপোজ হবার আগে একটা এয়ার-এগজস্টেড ভেসেলে রি-ক্যাপ করা যায়।'

'আমার হাতে কতটা সময় আছে?'

উত্তর দিতে আবার কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন রাহাত খান। 'আমরা অনুমান করছি—এই ধরো আধ ঘণ্টার মত।'

এবার রাহাত খানকে অপেক্ষা করতে হলো রানা কী বলে শুনবার জন্য। ঘাড় ফিরিয়ে রোশনির দিকে তাকাল ও। 'তুমি জানো জাঁ পল কোথায় থাকে?'

'জানি। দোতলায়। মানে, দোকানটার মাথায়।'

'চেনো?'

মাথা ঝাঁকাল রোশনি। 'ছোট চাচার কোন খবর জানে কিনা জিজ্ঞেস করবার জন্যে বড় চাচা তার কাছে আমাকে একবার পাঠিয়েছিলেন। বেশি দূরে নয়। আমরা হেঁটেই যেতে পারব।'

ফোনের দিকে মুখ ফেরাল রানা। 'সার, আমি তাহলে এখন রাখি?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। যতটুকু পার করো। আমাকে তুমি বাড়িতেই পাবে।'

চামচ আর একটা গ্লাস জার নিয়ে সেলারে নেমে এল রানা। দেখা গেল চামচের কোন প্রয়োজন নেই। ডক্টর দানিশের কটুগন্ধি উদ্ভাবন ভাঙা বোতলটার গলায় পাঁচ আউন্সের মত রয়ে গেছে। টুকরোটার এক দিকে এখনও ছিপি লাগানো, আরেক দিকে এবড়োখেবড়ো ধারাল কাঁচ–খাড়া ভাবে গোঁজা রয়েছে আহসানের দু'পায়ের মাঝখানে। অত্যন্ত সাবধানে, রুমালে জড়ানো হাত দিয়ে ধরল রানা ওটা। গাঢ় রঙের আঠালো সিরাপ গ্লাস জারে ঢালল ও। ক্যাপটা বন্ধ করল আঁটো করে।

সেলার থেকে উঠে এসে রোশনির হাত ধরে সিটিংরুমে চলে এল রানা, তাকে একটা সোফায় বসিয়ে নরম সুরে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল। রোশনি যেন নিজের জীবন আর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে। তাকে এক বাংলাদেশী লেডি অফিসারের হাতে তুলে দেবে রানা। তিনি প্রথমে কয়েকদিন দূতাবাসে একটা পরিবারের সঙ্গে ওর থাকার ব্যবস্থা করবেন, তারপর অত্যন্ত গোপনে ওকে পাঠানো হবে বাংলাদেশে। সেখানে একটা বোর্ডিং স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ হবে ওর। বড় চাচা মারা গেছেন, এখানেই তাঁকে সমাহিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ছোট একটা তোবড়ানো সুটকেস আগেই গুছিয়ে রেখেছিল রোশনি। তখন ভেবেছিল, বেরুতে হবে অনিশ্চিত অজানার পথে। একা নয়, সঙ্গে থাকবে প্রায় অথর্ব বড় চাচা। এখন বড় চাচা সঙ্গে নেই, আছে প্রায় অচেনা এক অভয়দাতা, যার হাত ধরে বেরিয়ে পড়তে রোশনির এতটুকু ভয় করছে না।

বাড়ির বাইরে খুব ঠাণ্ডা। তবে স্থির বা নিস্তব্ধ নয়। হালকা বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে খানিকটা বাতাসও আছে। গাছপালার ভিতর লাইটপোস্টগুলো হলদেটে আভা ছড়াচ্ছে। একটা থিয়েটারকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। ওদের পায়ের শব্দ খালি রাস্তার উপর আশ্চর্য ফাঁপা শোনাচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরে এসে বাম দিকে তাকাল রানা। পার্ক করা আরেকটা গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যানসিয়া।

'এই তো, আর একটু।' রানার হাঁটার ছন্দে সামান্য পতন ঘটতে হাত তুলল রোশনি। 'ওই সাদা দালানটা, ওপরতলার জানালায় পর্দা দেখা যাচ্ছে। ওটাই পল আংকেলের ফ্ল্যাট। তবে ওখানে তাঁকে পাওয়া যাবে না। উনি সারারাত কাজ করেন।' ফুটপাথ থেকে দালানটার পাশের সরু গলিটায় ঢুকে পড়ল সে। 'দোকানের একটা দরজা এদিকে। খুব সাবধানে ডাকতে হবে। পল আংকেল ভিজিটর পছন্দ করেন না।'

রোশনির পিছু নিয়ে গলিটায় ঢুকছে রানা, সাদা দালানের গায়ে একটা গাড়ির

আলো প্রতিফলিত হলো। ঝট করে রোশনির হাত ধরে একপাশে টেনে নিল রানা।

গাড়িটা থামল না, ঘণ্টায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল স্পীডে চলে গেল। ড্রাইভার জানে থামলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে। 'ভয় পেয়ো না,' রোশনিকে অভয় দিয়ে বলল রানা। 'আমি ভেবেছিলাম গাড়িটা গলির ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে।'

রোশনির নিরীহ নিষ্পাপ মুখে সকৃতজ্ঞ একটু হাসি ফুটল। লম্বা লম্বা পা ফেলে একটা দরজার সামনে চলে এল সে। নক করল কয়েকবার, তবে জোরে নয়। পিছন থেকে তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। রকিং বোল্ট সরাবার আওয়াজ শুনল ওরা। সেফটি চেইন যতটুকু ছাড় দিল ততটুকু ফাঁক হলো কবাট। ফাটলে চশমা পরা একটা মুখ, সাবধানে বাইরে তাকাচ্ছে।

'আমি রোশনি, আংকেল।'

'চলে যাও!' সরু, খসখসে কণ্ঠস্বর; প্রায় সন্ত্রস্তই বলা যায়। 'একবার তো বলেছি, তোমার ছোট চাচা এখানে নেই। তাঁকে আমি দেখিনি।' চশমার কাঁচটা প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু।

'আরে, ভেতরে ঢুকতে দিন। খুব জরুরী কাজ আছে,' আবেদন জানাল রোশনি। 'আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক আছেন, আপনার সঙ্গে কী যেন দরকার আছে ওঁর।'

রোশনির মাথার উপর দিয়ে চশমার দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'আপনার ইকুইপমেন্টের মধ্যে কি ভ্যাকিউম পাম্প আছে?' রোশনির চেয়ে অনেক ভাল ফ্রেঞ্চে জানতে চাইল ও।

'কী ব্যাপার?' পল কৌতূহলী না হয়ে পারল না, কারণ তার চোখের সামনে মুলো ঝুলিয়ে রেখেছে রানা—বড় অঙ্কের কড়কড়ে কয়েকটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্কের নোট।

'আপনার সাহায্য দরকার আমার,' বলল রানা। 'ডক্টর দানিশের জন্যে আপনি যে কাজটা করেছেন: একটা কন্টেইনার ইগজস্ট করে দেবেন, ওটায় লিকুইড রাখা হবে।' ক্যাপ পরানো কাঁচের জারটা উঁচু করে দেখাল।

'চেইন খুলছি,' মুলোর দিকে চোখ রেখে দ্রুত বলল পল।

দরজা বন্ধ ছিল, বন্ধই থাকল। ল্যাচ খুলল রোশনি। দরজার কবাট ওদের দিকে দু'ফাঁক হলো। ভিতরে ঢুকল ওরা। জার আর সুটকেস, দুটোই রানার হাতে।

মাথায় স্লেট বসানো একটা টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পল। টেবিলে বসানো একটা শটগান ওদের দিকে তাক করে রেখেছে সে, ব্যারেল দুটো কেটে ছোট করা। 'কী আছে সুটকেসে?' তার চোখে সন্দেহ।

'আমার কাপড়চোপড়,' বলল রোশনি।

'এখানে, আমার সামনে রেখে যান,' রানাকে বলল পল।

সুটকেসটা নামিয়ে তার উপর নোটগুলোও রাখল রানা। কেমিক্যালের দাগ লেগে নোংরা হয়ে আছে পলের স্মক, সাপের ছোবলের চেয়েও দ্রুত গতিতে

নোটগুলো সেই স্মকের পকেটে ভরে ফেলল সে।

পল চরম উত্তেজিত। একবার চোখ বুলিয়ে ল্যাবরেটরিটা দেখেই কারণটা বুঝে নিল রানা। যে জানে না তার দৃষ্টিতে বারো ফুটী জানালাবিহীন কামরাটাকে একটা টেস্টিং ল্যাব বলেই মনে হবে। কিন্তু রানার অভিজ্ঞ চোখ অন্য কথা বলছে। পল যদি ডাক্তারদের কাছ থেকে ব্লাড, ইউরিন আর মিউকাস নিয়ে ক্লিনিক্যাল অ্যানালাইসিস করেও, ব্যবসার এই অংশটা তার একটা ফ্রন্টমাত্র। আসলে এখানে কী ঘটছে জানতে হলে তাকাতে হবে বুদ্বুদ ভর্তি বকযন্ত্র, জটিল ডিস্টিলেশন ইকুইপমেন্ট আর একটা বেঞ্চের ওপর বসানো পিল প্রেস-এর দিকে। পল বেআইনী ড্রাগ তৈরিতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। আয়োজনটা ছোটখাট; গড়ে তোলা হয়েছে নলাকার গ্লাস রিফ্র্যাকশন ইউনিট, বানসেন বার্নার আর হাতে তৈরি অন্যান্য গ্লাস ডিভাইসের সাহায্যে। অকাট্য প্রমাণ হলো স্টেনলেস স্টীল মিক্সিং মেশিনটা, যেটা একসময় মার্সেই-এর ড্রাগ ব্যবসায়ীদের স্ট্যান্ডার্ড ইকুইপমেন্ট ছিল। পল এতক্ষণ সাদামাঠা ল্যাকটোজের সঙ্গে রিফাইন করা কোকেন মিশিয়ে চৌকো সেলোফেন এনভেলাপে ভরছিল—ওজন হবে চোদ্দো গ্রাম।

তোবড়ানো সুটকেসটা সার্চ করবার পর রানার দিকে তাকাল সে। 'ঠিক আছে, জারটা দিন। আমার কাছে একটা স্ট্রেস-ওয়াল ফিফটি কিউবিক সেন্টিমিটার টেস্ট টিউব আছে, ওটাতেই কাজ হবে। শেষবারের মতই, সিক্স হানড্রেড মিলিবারে নামিয়ে আনব প্রেশার। সময় লাগবে মিনিট দশেক।'

শটগান নিয়েই কামরার আরেকদিকে চলে গেল পল, নাগালের মধ্যে একটা ওঅর্কবেঞ্চে রেখে হাত দিল কাজে। পরিবেশটা রানার পছন্দ না হলেও রোশনিকে আশ্বস্ত করবার জন্য চেহারায় শান্ত একটা ভাব ধরে রাখল। পল এত বেশি সতর্ক, যেন যে-কোন মুহূর্তে বিপদ হওয়ার আশঙ্কা করছে সে। করা অবশ্য উচিতও। পুলিশী হানার ভয় ছাড়াও, এ-ধরনের নোংরা ব্যবসা হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রায়ই হামলা করে ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

পলের নার্ভাস ভাব রানার মধ্যেও খানিকটা সংক্রমিত হলো। কামরাটা গরম, চারদিকে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ। 'আমি সিগারেট খেলে আপনি কিছু মনে করবেন?' জিজ্ঞেস করল ও, জানে পল অনুমতি দেবে না।

ভ্যাকিউম পাম্পের সুইচ অন করল পল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এখানে নয়, প্লিজ। দেখতেই তো পাচ্ছেন, শেলফে কত রকম কেমিক্যাল আর অ্যালকোহল রয়েছে। আপনি বরং ফ্রন্ট অফিসে চলে যান। দরজা খোলা রাখুন, তাহলে আর আলো জ্বালতে হবে না।' ভ্যাকিউম পাম্পের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজে তার কিছু কথা চাপা পড়ে গেল।

সিগারেট ধরাল রানা, লাইটারের আলোয় অফিস কামরার ভিতরটা ভাল করে দেখে নিল। মেইন রাস্তার দিকে বেরোবার প্রধান দরজাটা খুব শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি, লোহার বার দিয়ে আটকাবার পর তালাও ঝোলানো হয়েছে। দরজার দু'পাশে একটা করে জানালা, মেটাল ভিনিশ্যান ব্লাইন্ড দিয়ে ঢাকা। একটা

ছিলকায় চাপ দিয়ে সরু ফাঁক তৈরি করল রানা, তাতে চোখ রেখে রাস্তার দিকে তাকাল। যতদূর দেখা যায় সব খালি পড়ে আছে। ব্লাইন্ডটা রানা ছেড়ে দিয়েছে, এক মুহূর্ত পর বাইরের একটা সচল আলো ওটার একটা অংশ আলোকিত করে স্থির হয়ে গেল। দুই ছিলকার সরু ফাঁকে চোখ রেখে আবার বাইরে তাকাল রানা। একটা গাড়ি বাঁক ঘুরে ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়েছে। হেডলাইট নিভে গেল, তবে কেউ নামল না।

গাড়িটা নিরেট দর্শন প্যানেল ফিট করা একটা ভ্যান, কমার্শিয়াল মডেল, তবে গায়ে কিছু লেখা নেই। তারপর উল্টোদিক থেকে কমানো আলো নিয়ে একটা সিডান যখন পলেদের দালান আর ভ্যানটার মাঝখানে থামল, রানা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল আসলে কী ঘটতে চলেছে।

অবৈধ ড্রাগের খোঁজে পুলিশ হানা দেবে, আর এর জন্য দায়ী ও নিজেই। ভ্যানটা এখানে কীভাবে এল, পরিষ্কার জানে ও। ঘটনাটা শুরু হয়েছে অন্ধকার থিয়েটারের পাশ থেকে একটা পুলিশ সার্ভেইল্যান্স টীম যখন একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে গভীর রাতে দ্রুত পায়ে হাঁটতে দেখল। একজনের হাতে সুটকেস রয়েছে, তাতে ড্রাগ কিনবার টাকা থাকা বিচিত্র নয়। তারপর ছেলে আর মেয়েটা গাড়ির আলো দেখে স্যাঁৎ করে একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। সার্ভেইল্যান্স টীমের সন্দেহ বাড়ল আরও। ওরা থামল কোথায়? ড্রাগ সাপ্লাইয়ার বলে সন্দেহ করা হয় এমন একজনের দরজায়। এরপর কি আর অ্যান্টি নারকোটিক ফোর্সকে না ডেকে পারা যায়?

জায়গামত লোকজন বসিয়ে প্রস্তুতি নিতে ওদের বোধহয় মিনিট পাঁচেক লাগবে। সিগারেটটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে পকেটে রেখে দিল রানা। ল্যাবে ঢুকবার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল ওর দিকে পিছন ফিরে ওঅর্কবেঞ্চে কাজ করছে পল। রোশনি দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে, স্লেট-টপড্ টেবিল আর পিছনের সিনডারব্লক ওয়াল-এর মাঝখানে। কোঁচকানো ভুরুতে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। ইঙ্গিতে তাকে সতর্ক থাকবার নির্দেশ দিল রানা। কী বুঝল কে জানে, মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'কাজটা এখনও বাকি?' পলের দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘুরল পল, ভ্যাকিউম গজ দেখবার জন্য ঝুঁকল। 'ছয়শো চল্লিশ,' পড়ল সে। 'আর এক মিনিট।'

কিন্তু ওদের হাতে আর এক মিনিটও নেই। পাশের দরজায় দমাদম ঘুসি পড়তে শুরু করেছে। পরমুহূর্তে বুলহর্ন হয়ে ভেসে এল একজন পুলিশ অফিসারের বাজখাঁই কণ্ঠস্বর–নির্দেশ দিচ্ছে, দরজা খোলো।

সঙ্গে সঙ্গে রিয়্যাক্ট করল পল। ভাব দেখে মনে হলো তার একটা ইমার্জেন্সী প্ল্যান আছে, সেটা সে নিয়মিত প্র্যাকটিসও করে। লাফ দিয়ে দেয়ালে বসানো মাস্টার সুইচ অফ করে দিল সে। ল্যাব অন্ধকার হয়ে গেলেও, কাঠের বেঞ্চ থেকে ছড়ানো বানসেন বার্নারের আলো ল্যাবের ভিতর ভৌতিক. অশুভ একটা পরিবেশ

তৈরি করল। ছোঁ দিয়ে শটগানটা পলকে তুলে নিতে দেখল রানা। দেয়াল ঘেঁষে শঙ্কিত রোশনির কাছে চলে এল ও, আর ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হয়ে খুলে গেল পাশের দরজা।

জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরা দুঃসাহসী প্রথম পুলিশ দোরগোড়ায় উদয় হলো। পলকে শটগান হাতে ছুটতে দেখেই হাতের কারবাইন থেকে সামান্য এক পশলা গুলি করল সে। ছুটে একপাশে সরে যাচ্ছিল পল, হোঁচট খেল। ভাঁজ করা এক হাঁটুর উপর ভর দিল, তবে শটগান ছাড়েনি।

স্লেট-টপড্ ল্যাব টেবিলটা উল্টে দিয়ে সেটার পিছনে আড়াল নিল রানা, টেনে নিজের পাশে বসাল রোশনিকে। পলের দোনলা শটগানের একটা নল গর্জে উঠল, ভাঙা দরজার দিকে তাক করা ছিল। পুলিশটাকে ল্যাব থেকে বের করে দিল শটগানের বুলেট। তবে বাইরে থেকে এবার এক সঙ্গে গর্জে উঠল অনেকগুলো অস্ত্র। শেলফের সমস্ত গ্লাস কন্টেইনার ঝন-ঝন শব্দে ভেঙে পড়ছে। স্লেট টেবিলেও আঘাত করল কয়েকটা বুলেট। এরপর কান ফাটানো শব্দের সঙ্গে শটগানের দ্বিতীয় গুলিটাও বের হলো, লাগল গিয়ে পাশের দেয়ালে। কমলা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কামরা। খাড়া হয়ে থাকা টেবিলের উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে একবার তাকাল রানা। শটগানের দ্বিতীয় বিস্ফোরণ মেইন গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ভাঙা পাইপের মোচড় খাওয়া প্রান্ত থেকে তিন ফুটী শিখা বেরুচ্ছে। হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে আহত পোকার মত নড়ে বেড়াচ্ছে পল মেঝেতে।

গোটা ল্যাব একটা অগ্নিকুণ্ড হতে চলেছে। ফ্রেঞ্চ নারকোটিক স্কোয়াড আগুনের রুদ্রমূর্তি দেখে পিছু হটতে বাধ্য হলো। কর্কশ কমান্ড শুনতে পেল রানা, কে যেন নিজের লোকজনকে ডেকে নিচ্ছে।

আগুন দ্রুত ছড়াল। ওঅর্কবেঞ্চ সহ সামনের পুরোটা দেয়াল ঢাকা পড়ে গেছে, ফলে অফিসে যাওয়ার পথ বন্ধ। বেরোবার একটাই পথ খোলা, কিন্তু সশস্ত্র লোকজন পাহারা দিচ্ছে সেটা। পল ওদেরকে গুলি করায় এই ল্যাব থেকে কেউ সারেন্ডার করতে চাইলে সে সুযোগ ওরা তাকে না-ও দিতে পারে। মাথার উপর হাত তুলে রোশনিকে নিয়ে বাইরে বেরোনো মাত্র গুলি করে যদি ফেলে দেয়, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আবার দাউ-দাউ এই আগুনের মাঝখানে থাকলে পুড়ে মরতে হবে।

কী করতে হবে রোশনিকে বুঝিয়ে দিল রানা। তার ছোট্ট হাতটা মুঠোয় নিয়ে সিধে হলো, যত জোরে পারা যায় চিৎকার করছে: 'গুলি থামান! আমরা ধরা দিচ্ছি! আমাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই! আমরা বেরুচ্ছি!'

নিজেদেরকে নিরীহ দাবি করে ঝামেলা বাড়ানোর কোন মানে হয় না, ও-সব পরে ব্যাখ্যা করলেও চলবে। আগে আগুন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা হোক তো।

কিন্তু ওর চিৎকারের উত্তরে কেউ কিছু বলছে না। ওরা হয়তো কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না, বা বুঝতেই পারেনি। কামরার ভিতর অগ্নিশিখার ফোঁসফোঁসানি

রীতিমত কর্ণবিদারক হয়ে উঠেছে। রানা দেখল, যে দরজা দিয়ে ওরা বেরুবে সেটাতেও আগুন ধরে গেছে। বাঁচতে হলে এখনই বেরুতে হবে, পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।

রোশনির হাতটা আরও শক্ত করে ধরল রানা। ঠিক এই সময় ওদের চারপাশে সব কিছু ভেঙে পড়তে শুরু করল। দালানের ভিত আর কাঠামো ধরে কেউ যেন প্রচণ্ড ঝাঁকি দিচ্ছে। পলের ওভারহেড স্টোরে রাখা এক্সপ্লোসিভ কেমিক্যালে আগুন না ধরলে এ-ধরনের চেইন রিয়্যাক্শন হওয়ার কথা নয়।

ভারী টেবিলটা নড়তে শুরু করে ওদেরকে পিষে ফেলতে চাইছে। রোশনিকে নিয়ে এক পাশে লাফ দিয়ে কোন রকমে জান বাঁচাল রানা। ঘাড় ফেরাতে দেখল, পিছনের দেয়ালটা হুড়মুড় করে ধসে পড়ছে। মাথার উপর সিলিংটা প্রথমে উপর দিকে ফুলল, তারপর দেখা গেল কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে নীচে নেমে আসছে। আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই দেখে অন্ধকার লক্ষ্য করে লাফ দিল ওরা, যেখানে একটু আগে দেয়ালটা ছিল।

দৌড়াবার সময় রোশনির হাতটা রানা ছাড়েনি। ধোঁয়া আর আগুনের আঁচ পিছিয়ে পড়েছে, তাজা বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে ওরা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো—সত্যি বেঁচে আছে ওরা!

সাত

ওদের পিছনে সগর্জন আগুনের পাঁচিল গলির পথ বন্ধ করে রেখেছে। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে বোঝা গেল ওই পাঁচিলের ওপারে রয়েছে পুলিশ আর নারকোটিক স্কোয়াডের লোকজন। গোটা ব্লক বা পাড়াটা আধ চক্কর ঘুরে পিছন দিক দিয়ে ল্যানসিয়ার কাছে পৌঁছাল রানা, ফুটপাথ ধরে আসবার সময় উদ্বিগ্ন জনস্রোতের উল্টোদিকে হাঁটতে হয়েছে ওদেরকে।

গভীর রাত, পিছনের দরজা দিয়ে অফিস খুলে কাজ শুরু করে দিয়েছে সুরভি। বেচারির চোখ ছলছল করছে। রানা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই রিপোর্ট করল: রানা এজেন্সির লোকজন ৮৭ নম্বর রু হেনড্রিক্স থেকে লাশটা সরিয়ে এনে শহরের বাইরের একটা কবরস্থানে গোপনে মাটি দিয়ে এইমাত্র ফিরে এসেছে।

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করল রানা। তারপর রোশনির দায়িত্ব সুরভিকে বুঝিয়ে দিয়ে নিজের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল, বলে এল কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে।

রানার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে প্রথমেই বিসিআই চীফ জানতে চাইলেন: 'কি, খানিকটা নুমনা উদ্ধার করতে পারলে?'

'না, সার, পারিনি। আসলে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি। সার, আপনি কোন

ইনফরমেশন পেলেন? আমার কাছে গোটা ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে।'

'এর কারণ রেদোয়ান আহমেদ কী কী করে গেছেন, সব আমরা জানি না। কমিউনিকেশন গ্যাপ, রানা। তবে এভাবে ধাঁধার জট ছাড়াবার চেষ্টা করো তুমি: মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের ইয়াকুব মালিক ছিলেন রেদোয়ান আহমেদের কনট্যাক্ট। তাঁর মত একজন টপ স্পাইকে যখন খুন করা হয়েছে, ধরে নিতে হবে রেদোয়ান আহমেদকেও বাঁচিয়ে রাখা হবে না...'

'হয়ওনি, সার,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আমি জেনেছি।'

রাহাত খানের প্রতিক্রিয়া হলো পাঁচ সেকেন্ডের বিরতি। 'এর মানে কি তুমিও রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে গেছ, রানা?'

'ঠিক বলতে পারছি না,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'নমুনা হারানোটা যদি লাইনের শেষ মাথা হয়, ফিল্ডে আমরা নেই।'

'আচ্ছা। তাহলে আশায় বুক বাঁধো। ওটা না হলেও চলবে। ডক্টর দানিশকে ইরাক থেকে বের করে আনতে প্রচুর টাকা খরচ হয় আমাদের, বিনিময়ে ওই জিনিসটা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি প্রম । করতে চেয়েছিলেন তাঁর আবিষ্কার কতটা গুরুত্ব বহন করে। নমুনাটা পেলে টেস্ট করে আমরা জানতে পারতাম REAM সম্পর্কে যা দাবি করা হচ্ছে তা কতটুকু সত্যি।'

'REAM, SIR?'

'ওটা হচ্ছে রেইডিয়ান্ট এনার্জি অ্যাবজর্বশ্যান ম্যাটিয়ারিয়াল-এর সংক্ষেপ। আমাদের ডিফেন্স এক্সপার্টরা বলছেন, এটার নাকি কাজ করার কথা।'

'কী কাজ করার কথা?' রানার অন্ধকার কাটছে না।

'এনার্জি অ্যাবজর্ব। সত্যি কাজ করলে এটাকে যুগান্তকারী সায়েন্টিফিক ব্রেকথ্রু না বলে উপায় নেই।'

'কিন্তু সার, আমি তো জানি এনার্জি হজম করার চেয়ে উৎপাদনেই মানুষের বেশি আগ্রহ।' রানা হাসছে না।

'হ্যাঁ, তবে এটা বিবেচনা করে দেখো: REAM যে-কোন সারফেসে অ্যাপ্লাই করা হোক না কেন, ওই সারফেসে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি এনার্জি তাক করা হলে সেটাকে আটকে রাখবে, সারফেসটা হয়ে উঠবে নন-রিফ্লেক্টিভ। বুঝতে পারছ? REAM ইলেকট্রনিক ইমিশান অ্যাবজর্ব করে...রাডার...সোনার... ইনফ্রারেড। তত্ত্বীয় সিদ্ধান্ত হলো: যে-কোন প্লেন, সাবমেরিন, স্পেস ভেহিকেল, মিসাইল বা ট্যাংকে REAM-এর প্রলেপ মাখালে ওগুলো আর চোখে ধরা পড়বে না। ভাবো একবার!'

এরই মধ্যে ভেবে বসে আছে রানা। যা না হয়ে পারে না তাই হচ্ছে। মাথাটা ঘুরছে ওর। এটা একটা পাল্টা অস্ত্র, মিলিটারি হার্ডওয়্যার-এর জগতে সত্যিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে। যে-সব অফেন্সিভ আর ডিফেন্সিভ উইপন সিস্টেম দূরবর্তী টার্গেট খুঁজে বের করবার জন্য ইলেকট্রনিক ইমপালস্-এর উপর নির্ভর করে, সেগুলো সবই রাতারাতি বাতিল হয়ে যাবে। লক্ষ্যবস্তুতে স্ক্যানিং

ইলেকট্রনিক বীম আঘাত করলে সাধারণত একটা দুর্বল একক ফেরত আসে। বহুগুণ অ্যামপ্লিফাই করা হলে গ্রাউন্ডের ভিজুয়াল প্লটিং স্ক্রিনে আলোর একটা স্পট হিসাবে রেজিস্টার হয় ওটা, তখন ডিসপ্লে দেখে বোঝা যায় কোথায় অবস্থান করছে আবিষ্কৃত টার্গেট, রেঞ্জ কত।

ডক্টর দানিশের REAM এসবই বদলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তাঁর জাদুরও বাড়া পদার্থ যেভাবেই হোক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাওয়ার ইমপালস্ অকেজো করে দেয়। কোন রকম ইলেকট্রনিক একো তৈরি হতে পারে না। গ্রাউন্ড ট্র্যান্সমিটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডিটেকশন অ্যাপারেটাস কোনও রিটার্ন সিগন্যাল রিসিভ করে না। এ যেন সার্চিং বীম-এর বিনা বাধায় সীমাহীন মহাশূন্যে চলে যাওয়া। হয়তো সত্যি তাই যায়। ইকুইপমেন্ট অপারেটরের দৃষ্টিতে কোন অবজেক্টের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না–অদৃশ্য একটা মোড়কে লুকানো থাকে সেটা। কাজটা যেভাবেই করা হোক, আধুনিক রণকৌশল আর যুদ্ধাস্ত্রের উপর অবিশ্বাস্য প্রভাব ফেলবে।

চিন্তা-ভাবনার জন্য রানাকে খানিকটা সময় দিলেন রাহাত খান, তারপর বললেন, 'তোমাকে যখন অ্যাসাইনমেন্টটা দেয়া হয়, এত সব আমাদের জানা ছিল না। এখন যখন মুবারক ফর্মুলার গুরুত্ব জানা গেছে, যে-কোন মূল্যে ওটা আমাদেরকে পেতে হবে। তুমি জানো কেন।' শিষ্যকে পরীক্ষা করছেন তিনি।

'কারণ অন্য যার হাতেই পড়ুক, ক্ষমতার ভয়ানক একটা ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হবে,' জবাব দিল রানা। 'একমাত্র আমরাই ফর্মুলাটা পাবার পর প্রথমে দেখব শুধু ভাল কোন কাজে ওটা ব্যবহার করা যায় কিনা, না গেলে নষ্ট করে ফেলব।'

'রাইট। তবে এ জিনিস কে না চাইবে–খুব সাবধান, রানা! আরেকটা কথা, আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখনও কিন্তু ডক্টর মুবারক–এই কথাটা ভুলে যেয়ো না।'

'না, সার, ভুলিনি। সার, কোড নেম আরবিটার–আগে কখনও শুনেছেন?'

'সেডরিক থান্ডার,' যেন মুখস্থ বলে গেলেন বিসিআই চীফ। 'জার্মান-ইহুদি। ফ্রী-ল্যান্সার মাফিয়া ডন। ইসরায়েল, আমেরিকা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, এবং সবশেষে রাশিয়াতেও ট্রেনিং নিয়েছে সে। ওরা, আরও অনেকে, কোন না কোন সময় ব্যবহার করেছে তাকে। এক এক করে আবার তারা ওকে বর্জনও করেছে। তার কাজে নাকি সূক্ষ্মতার অভাব। অকারণে হিংস্র আচরণ করে।

বস থামতে রানা বলল, 'ডক্টর দানিশের ভাইঝি আমাকে বলেছে, বেশ কিছুদিন ধরে চিকিৎসার জন্যে সুইটজারল্যান্ডে যেতে হয় তাঁকে। তার মানে রোগটা সিরিয়াস?'

'ডক্টর দানিশ সম্পর্কে সব তথ্যই হয় অস্পষ্ট, না হয় অসম্পূর্ণ। তাঁর এই অসুস্থতা নিয়ে আমরা সবাই খুব চিন্তিত। রোগটার নাম–SCLEROSING TANENCEPHALITIS, একটা ডিজেনারেটিভ ব্রেইন ডিজিজ। অ্যাডভান্সড্ স্টেজ, প্রগনোসিস অনুকূল নয়।

'হ্যাঁ, কন্ট্রোলড্ ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে ইঞ্জেকশন নেয়ার জন্যে নিয়মিত ব্যবধানে সুইটজারল্যান্ডে যেতে হয় তাঁকে। মাঝখানের সময়টা মাইনর এপিলেপটিক স্প্যাজম দমিয়ে রাখার জন্যে প্রেসক্রাইব করা ওষুধ খেতে হয় প্রতিদিন।'

জানে বস্ কোন সাহায্যে আসবেন না, তবু রানা জিজ্ঞেস করল: 'আপনি জানেন, সুইটজারল্যান্ডের কোথায়? কোন হসপিটালে?'

'খোঁজ নিতে বলা হয়েছে, আশা করছি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জানতে পারব।'

'আমি জেনেভায় যাচ্ছি, স্যার।'

'হিলটনে উঠবে,' বললেন রাহাত খান। 'গুড লাক।' লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রাত দুটোর দিকে ফ্ল্যাটে ফিরে রানা দেখল লেনা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। একটা রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে এসেছে ও, আলো নিভিয়ে দিয়ে সিটিংরুমের সোফায় শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

রানার ঘুম ভাঙল পোচ করা ডিমে ছড়ানো গুঁড়ো গোল মরিচ আর তাজা কফির গন্ধে। চোখ মেলে দেখল সদ্য স্নান করা লেনা ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোফার সামনে। ট্রেটা নামিয়ে রেখে সিঙ্গেল একটা সোফায় বসল সে। কথা না বলে হাসি মুখে শুধু তাকিয়ে থাকল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা: 'ধন্যবাদ, লেনা। তোমার শরীর ফিট তো?' সুরটা এমন, রানা যেন প্রিয় কাউকে আদর করছে। সকাল সাতটা বাজে।

আকাশ থেকে পড়ল মেয়েটা। 'মানে, মঁশিয়ে?'

'না, তোমাকে আমি অপেক্ষার এই যন্ত্রণা আর সম্ভাব্য বিপদ থেকে আপাতত দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাব। জানতে চাইছি লম্বা জার্নি তোমার সইবে কিনা।'

'খুব বড় একটা দুঃসংবাদ আছে।' সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্রেয়ার লেনা। 'আপনি চেপে রেখেছেন, মঁশিয়ে।'

রানা ইতস্তত করছে।

'আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলুন, মঁশিয়ে। আমি জানতে চাই কী হয়েছে।'

'তুমি শান্ত হও, লেনা। বসো।'

লেনা কথা বলল না, এগিয়ে এসে রানার একটা হাত ধরে ঝাঁকাল। 'আমি খুব শক্ত মেয়ে, আপনি বলুন। প্লিজ।'

'হ্যাঁ, লেনা,' বলল রানা। 'সবচেয়ে খারাপটাই ঘটে গেছে। সে নেই।'

'নেই মানে?' রানাকে ছেড়ে দিল লেনা। স্থির হয়ে থাকবার চেষ্টা করলেও, পারছে না, টলছে।

লেনাকে ধরে বসিয়ে দিল রানা। 'তাকে সরিয়ে দিয়েছে অন্ধকার জগতের

লোকেরা। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলে তুমি আর আমিও এখন নিরাপদ নই। তাই এখান থেকে আমাদের সরে পড়া উচিত। তুমি কোথায় যেতে চাও বলো। আমি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।'

রানার কথা লেনা বোধহয় শুনতেই পাচ্ছে না। 'এত ভাল একজন মানুষকে ওরা মেরে ফেলল?' আপনমনে বিড়বিড় করছে সে। 'কেন? কী করেছিল সে?'

'না, লেনা, রেনাদ খারাপ বা অন্যায় কোন কাজ করেনি। বরং দশজনের ভাল হয় এমন একটা কাজ করতে গিয়ে খুন হয়েছে সে।'

মুখ ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল লেনা। 'দূতাবাসের লোকেরা বেশিরভাগ স্পাই হয়, আমি জানি। রেনাদ যে স্পাই ছিল, এ-ও আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আপনি? আপনি কি?'

'এখন তোমাকে কথাটা বলা যায়। রেনাদ যে বিপদটায় পড়েছিল, আমি তাকে সেটা থেকে মুক্ত করতে এসেছিলাম,' বলল রানা।

'তার মানে আপনিও একজন স্পাই।'

রানা চুপ করে থাকল।

'এর কোন বিচার নেই?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল লেনা।

'বিচার হয়তো নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে লেনাকে আশ্বস্ত করল রানা, 'তবে প্রতিশোধ অবশ্যই আছে।'

'আমি সেই প্রতিশোধ নিতে চাই!' হিসহিস শব্দ করে বলল লেনা, ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন সে এতটুকু টলছে না।

'তাতে সাংঘাতিক ঝুঁকি আছে, লেনা। সে বড় কঠিন পথ।'

'ঝুঁকি? আমার জীবনে আর রইলটা কী যে ঝুঁকি নিতে ভয় করবে? আমি তো শেষই হয়ে গেছি।' খপ করে রানার হাত আঁকড়ে ধরল লেনা। 'আমাকে আপনার সঙ্গে নিন, প্লিজ। আমি শুধু একটা সুযোগ চাই।'

'সত্যি তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও?'

লেনার রক্তবর্ণ চোখ সাদা দেয়ালে স্থির হয়ে আছে। কথা বলবার সময়ে তার কণ্ঠস্বর এতটুকু কাঁপল না। 'আহ্! চাই, মঁশিয়ে! প্রাণ দিয়ে হলেও চাই।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা।

অটোরুট দু সোলেইল ধরবার জন্য রুট এন-ফিফটিওয়ান পার হতে হলো রানাকে। পথে একবার থেমে ল্যানসিয়াতে তেল ভরে নিয়েছে, মেকানিকদের পরামর্শ অনুসারে দুটো চাকাও বদলেছে।

শোকের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবার পর ভ্রমণসঙ্গিনী হিসাবে লেনা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল। রানাকে ভাল শ্রোতা পেয়ে রেদোয়ান আহমেদের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক আর ওদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ছিল সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, লেনার মা-বাবা মত দিন বা না দিন, একবছর পর বিয়ে করবে ওরা। রেনাদ বিয়ের পর লেনাকে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরতে চেয়েছিল;

সেজন্যই লেনার মা-বাবা ওদের বিয়েতে রাজি হতে পারছিলেন না। প্রসঙ্গত জানা গেল, লেনার মা-বাবা দু'জনেই মার্সেইতে থাকেন, ওখানকার একটা কলেজে মাস্টারী করেন তাঁরা। লেনা প্যারিসের একটা হোস্টেলে থেকে ফাইন আর্টস-এ ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়েছে, ইচ্ছে আছে মাস্টার্স-এ ভর্তি হবে।

কথা বলতে বলতে জানালার দিকে কাত হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সহজ-সরল মেয়েটা।

সীমান্তে ল্যানসিয়ায় তল্লাশী চালানো না হলেও, কাস্টমস অফিসাররা রানার দিকে চ্যালেঞ্জ আর সন্দেহের চোখে তাকাল। তারপর যখন দেখল ওর কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট রয়েছে, ঢিল পড়ল সবার পেশীতে। লেনার পাস্‌পোর্টেও একবার শুধু চোখ বুলাল তারা।

বরফ ঢাকা পাহাড়ী ঢালগুলো সুইটজারল্যান্ডকে শীতকালীন ট্যুরিস্টদের জন্য স্বর্গে পরিণত করেছে। মার্বেল, আয়না আর কাঁচ দিয়ে মোড়া হিলটন ইন্টারন্যাশনাল মেঘ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে লেক জেনেভার পুব কোণে, পিছনে আকাশ ছুঁয়েছে মাউন্ট ব্লাঙ্ক।

রিসেপশন ক্লার্কের ভুরু স্থির হয়ে গেল পাসপোর্ট দুটোর নামে কোন মিল নেই দেখে। রানার পাসপোর্টটা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময় নিয়ে পরীক্ষা করল সে, তারপর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে ভাঁজ করা একটা নোট ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'আপনার জন্য, সুইচবোর্ড থেকে,' আর কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করল না। ভাঁজ খুলে রানা দেখল ওর নামের পাশে একটা টেলিফোন নম্বর লেখা রয়েছে, প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল এরিয়া কোড সহ। কলটা জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ কিনা বোঝবার কোন উপায় নেই।

এলিভেটর ওদেরকে নয়তলায় তুলে আনল। সুইটটায় বেডরুম একটা হলেও, বাথরুম দুটো।

প্রথমে ইয়াকুব মালিক, তারপর রেদোয়ান আহমেদ, সবশেষে শাকিল মাহমুদকে টরচার করে অনেক গোপন তথ্যই জেনে ফেলেছে আরবিটার। রানা যেমন ভেবেছে, সে-ও তেমনি ভাববে: নিখোঁজ বিজ্ঞানীর ট্রেইল ধরবার সম্ভাব্য জায়গা হলো সুইটজারল্যান্ড। রানার চেয়ে সে এগিয়েও থাকতে পারে।

লেনা বাথরুমে যাওয়ার পর ফোনে হাত দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল সেটা। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ও। ওকে চমকে দিয়ে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল প্যারিস থেকে। 'হ্যালো, মাসুদ ভাই, আমি সুরভি।'

প্রথমেই যে প্রশ্নটা রানার মনে জাগল: 'রোশনি কেমন আছে?'

'খুব ভাল আছে। মাসুদ ভাই; আমি সেজন্যে ফোন করিনি। ঢাকা থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেভার এই ঠিকানাটা আমি যেন আপনাকে জানাই। বলি?'

'এক মিনিট। তোমার এই ফোন নম্বর কোথাকার?'

'দূতাবাসের,' বলল সুরভি। 'আনলিস্টেড অ্যান্ড স্ক্র্যাম্বলড্।'

'ঠিক আছে। বলো।'

'ইনসটিটিউট দ'সাইকোলগুয়ে–৭৩ নম্বর কার্লস্ট্রাসে।'

'গুড।'

'নট সো গুড, মাসুদ ভাই,' বলল সুরভি। 'কারণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোন রোগী সম্পর্কে বাইরের কাউকে কিছু জানাতে রাজি নন। সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ভদ্রলোকের নাম গ্লেন গিলক্রিস্ট–নিরেট একটা পাঁচিল বললেই হয়।'

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত রানার মনে পড়ে গেল, ডক্টর দানিশ যে হসপিটালে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোশনি সেটার নাম-ঠিকানা না জানলেও, ওখানকার সংশ্লিট ডাক্তার তাঁর রোগী সম্পর্কে একা শুধু রোশনির সঙ্গে কথা বলতে রাজি হবেন। রোশনি ডাক্তারের ফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলেছে, তবে সেটা সংগ্রহ করা তেমন কঠিন কিছু না।

'তুমি দূতাবাসে,' সুরভিকে বলল রানা, 'আর রোশনি?'

'এখানেই, অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে।'

'নিরেট পাঁচিলের কথা বলছি। তাঁর ফোন নম্বর জানো?'

'জানি, ঢাকা থেকে পেয়েছি। বলব?'

'আমাকে নয়। রোশনিকে জানাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'রোশনি ভদ্রলোককে বলবে, তার ছোট চাচার খবর জানার জন্যে মাসুদ রানা নামে এক আত্মীয় জেনেভায় পৌঁছেছেন, তিনি যেন তাঁকে নির্দ্বিধায় সব কথা জানান। উত্তরে ডাক্তার ক্রী বললেন হিলটনের নম্বরে ফোন করে জানাও আমাকে।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল সুরভি।

'অনধিকার চর্চা না হয়ে গেলে জানতে পারি,' বাথরুমের দরজা থেকে জিজ্ঞেস করল লেনা, 'কার সঙ্গে কথা বললেন?'

'তুমি চিনবে না, একটা মেয়ে...'

'সে কি আপনাকে ভালবাসে?'

মাথা নাড়ল রানা।

'আপনাকে ভালবাসে এমন কেউ নেই?'

কিছু চিন্তা না করেই রানা জবাব দিল, 'না।'

হঠাৎ লেনার চেহারায় স্বস্তির একটা ভাব ফুটল। 'যাক।'

রানা বিস্মিত। 'মানে?'

হেঁটে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল লেনা, মাথায় জড়ানো ভিজে তোয়ালেটা খুলছে। 'আপনারা, দূতাবাসের লোকেরা যে স্পাই, এ তো দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। কোন মেয়ের আপনাদের কাউকে ভালবাসা উচিত নয়।'

ওর ব্যাপারে লেনার ভুল ধারণা থাকলেও, সেটা শুধরে দেওয়ার কোন ইচ্ছে নেই রানার, তবে তার বক্তব্য সমর্থন করল। 'না, উচিত নয়।'

আয়নার ভিতর দিয়ে ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখছে লেনা। 'কিন্তু এটাই বা

কেমন কথা যে কোন মেয়ে আপনাকে ভালবাসে না?'

'ওরা হয়তো জানে যে হঠাৎ খুন হয়ে যেতে পারি আমি।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে যারা একই পেশায় আছে, সে-সব মেয়েরা? তাদের জীবনও তো বিপন্ন। কাজেই তারা আপনার মত লোকদের অনায়াসেই ভালবাসতে পারে।'

মনে মনে লেনার বুদ্ধির প্রশংসা করল রানা। বাস্তব অবস্থাটা খুব সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছে মেয়েটা। ওর জীবনে যত না প্রেম এসেছে, তারচেয়ে মেয়ে এসেছে বহুগুণে বেশি। হিসাব আর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সে-সব মেয়েরা বেশিরভাগই হয় ওর পথেরই পথিক, নয়তো ওর মত অত্যন্ত বেপরোয়া স্বভাবের।

'হ্যাঁ, সেরকম মেয়েদের সান্নিধ্য আমি পাই,' বলল রানা। 'একটু হয়তো বেশিই পাই। কিন্তু সে-সব ঠিক ভালবাসা নয়।'

'আপনাকে আমার অসুখী মানুষ বলে মনে হয়নি।' চুলে ব্রাশ চালাচ্ছিল লেনা, থেমে রানার দিকে ঘুরল। 'অথচ জানি ভালবাসা না পেলে কাউকে সুখী বলে মনে হয় না। ব্যাপারটা মেলাতে পারছি না।'

হঠাৎ কী হলো রানার, যেন অকস্মাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছে; স্বর্গীয় একটুকরো উদ্যান উদ্ভাসিত হলো, সমস্ত রঙ আছে সেখানে, আছে সব ফুল আর গন্ধ; সেই উদ্যানের ভিতর নদী বইছে, নদীর উপর ঝুলে আছে রঙধনু, নীচে কোমরে নেংটি জড়ানো মঙ্গাপীড়িত মানুষ মিছিল করে কাজের সন্ধানে চলেছে; নেপথ্যে কেউ গাইছে: 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি...'

'মিলবে,' মৃদু হাসল রানা। 'একটু উল্টে নাও, তাহলেই মিলবে। আমাকে কেউ ভালবাসে না, তা হয়তো ঠিক; কিন্তু আমি তো ভালবাসি। আমি ভালবাসি আমার দেশকে!'

এক ঘণ্টা পর ফোন করল সুরভি। ডাক্তার গ্লেন গিলক্রিস্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে রোশনি। কাল সকালে মাসুদ রানার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন তিনি।

সন্ধ্যার পর লেনাকে ফ্যাশন শো দেখাতে নিয়ে এল রানা। অনেক বাছাই করে একটা স্কার্ট আর টপ প্রেজেন্ট করল, দাম শুনে বিব্রত হবে ভেবে বিল মেটাল তাকে আড়াল করে। হোটেলে ফিরবার পথে একটা রেস্তোরাঁয় খেল ওরা। থান্ডার বা তার লোকজন আশপাশেই আছে, এটা ধরে নিয়ে চোখ-কান খোলা রেখেছে রানা। তাদের অনুপস্থিতি ওকে স্বস্তি দান করছে না, বরং উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলছে। কাউকে দেখতে না পাওয়ার সম্ভাব্য দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এক, রানাকে পিছনে ফেলে অনেক সামনে চলে গেছে তারা, হয়তো এরই মধ্যে ডক্টর দানিশ তাদের নাগালের মধ্যে চলে এসেছেন। দুই, ছদ্মবেশ নিয়ে আশপাশেই আছে, কিন্তু রানা তাদেরকে দেখেও চিনতে পারছে না।

হোটেলে ফিরে এসে লেনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করল রানা। তারপর ক্লান্ত মেয়েটাকে ঘুমোবার সুযোগ করে দিয়ে সিটিংরুমে ফিরে টিভি খুলে খবর শুনল।

টিভি আর আলো নিভিয়ে দিয়ে রাত এগারোটায় ডিভানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। রাত তিনটের সময় একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু শত চেষ্টা করেও কী দেখেছে মনে করতে পারল না। বাথরুমে যাবার জন্য ডিভানে উঠে বসে সাইড টেবিলের ল্যাম্পটা জ্বালতে চোখে পড়ল ব্যাপারটা।

ব্রাউন রঙের একটা কম্বল টেনে নিয়ে শুয়েছিল রানা। ঘুমাবার পর কে যেন কালো রঙের আরেকটা কম্বল ওর গায়ে বিছিয়ে দিয়ে গেছে। কে মানে নিশ্চয়ই লেনা।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই ছুটল ওরা। ঠিকানা ধরে হাসপাতালটা খুঁজে বের করতে কোন ঝামেলা হলো না। বিরাট দালান; চারদিকে রোগী, ডাক্তার আর নার্সরা ছুটোছুটি করছে।

রিসেপশনে খোঁজ নিতে জানা গেল, ডাক্তার গিলক্রিস্ট রানার জন্য নিজের চেম্বারে অপেক্ষা করছেন। একজন ওয়ার্ডবয়ের পিছু নিয়ে পৌঁছে গেল রানা চেম্বারে, লেনাকে ওয়েটিংরুমে বসিয়ে রেখে এসেছে।

ডাক্তার গিলক্রিস্ট খুব ব্যস্ত মানুষ, হয়তো সেজন্যই আচরণে রসকষ বা বিনয়ের অত্যন্ত অভাব। রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে প্রথমেই ডক্টর দানিশ মুবারকের সন্ধান জানতে চাইলেন তিনি, ভাবটা যেন রানা তাঁকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। 'আমি তো আপনার কাছেই তাঁর খোঁজ নিতে এসেছি,' ওর একথা শুনে মাথা নেড়ে বললেন, সংশ্লিষ্ট রোগীকে তিন দিন আগে শেষবার দেখেছেন তিনি। তখন তাঁর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। ইনটেনসিভ কেয়ার-এ ভর্তি করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ডক্টর দানিশ রাজি হননি।

ডক্টর দানিশের হাসপাতালে ভর্তি হতে না চাওয়ার কারণ রানা আন্দাজ করতে পারছে—যে-কোন জায়গায় একটানা বেশিক্ষণ থাকাটা তাঁর জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে।

'আপনি কি ডাভোস-এ গিয়েছিলেন?' আচমকা উদ্ভট একটা প্রশ্ন করে আবার রানাকে বিস্মিত করলেন ডাক্তার গিলক্রিস্ট। 'কিংবা ওখানে আপনাদের কোন আত্মীয়-স্বজন আছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কেন?'

'রোগীকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সব মিলিয়ে পাঁচটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিই আমরা, একেকবার একেকটা ওষুধ খেতে হবে। সেই প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে কাল ডাভোস থেকে একটা ওষুধ কেনা হয়েছে।'

'ওখানে তিনি কেন যাবেন?'

'সেজন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের কেউ ওদিকে আছেন কিনা।'

রানা এক সেকেন্ড দেরি করে মাথা নাড়ছে। জেনেভা থেকে দুশো মাইল দূরে ডাভোসে কেন গেলেন তিনি? জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা জানলেন কীভাবে কাল

একটা প্রেসক্রিপশনের ওষুধ কেনা হয়েছে?'

'ডোজ সম্পর্কে ফার্মাসিস্ট নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। ভদ্রলোক হাসপাতালে ফোন করে জানতে চান প্রেসক্রিপশনে হিজিবিজি করে আসলে কী লেখা হয়েছে। হাসপাতাল থেকে পরে আমাকে জানানো হয়, কলটা এসেছিল ডাভোস-এর মোহায়ের'স অ্যাপথিকারি থেকে। তবে পাল্টা ফোন করলে কোন লাভ হত না।'

'কেন?'

'সুইস আইনে ফার্মাসিস্টকে নিষেধ করা আছে, নিয়ন্ত্রিত ওষুধ-পত্র কার কাছে কী বিক্রি করা হলো তা কাউকে জানানো যাবে না।' হাতঘড়ি দেখলেন ডাক্তার গিলক্রিস্ট। 'দুঃখিত, আমাদের সময় এখানেই শেষ হয়ে গেল। ভাল কথা, রোগীকে যদি পান তো মনে করিয়ে দেবেন যে জরুরী কয়েকটা টেস্ট এখনও তাঁর করা হয়নি।'

'ধন্যবাদ,' বলে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা।

লেক জেনেভাকে চক্কর দিয়ে ছুটছে গাড়ি। তুমুল গতি বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠতে খুব সাহায্য করল লেনাকে। দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক দৃশ্য ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে; কখনও গাঁ-গেরামের সমতল ছবি, আবার তার পাশেই হয়তো আকাশ ছোঁয়া পাহাড়চূড়া। অরণ্য ঢাকা সরু সরু ঢালের মাঝখানে ব্রাউন রঙের ছাদ সহ কটেজ। প্রকাণ্ড ঝুল পাথরের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একটা সরাইখানা, রোপওয়ে ধরে পৌঁছাতে হবে।

ওরা ডাভোসে পৌঁছে দেখল রাস্তা-ঘাট সব বরফে ঢাকা পড়ে আছে। ডাভোসপ্লাজ-এ মোহায়ের অ্যাপথিকারি। কাউন্টারে দাঁড়ানো হাসি খুশি তরুণ, বয়স এত কম যে শিক্ষানবিস বলে মনে হলো। পিছনে বয়স্ক আরেকজনকে দেখা গেল, টেলিফোনে কথা বলছে। দ্বিতীয় লোকটার সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশি হত রানা, তবে তরুণকেই জিজ্ঞেস করল। অপ্রত্যাশিত হলেও, সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাওয়া গেল। 'কী বলেন, কেন মনে থাকবে না! নিশ্চয়ই ডক্টর মুবারকের প্রেসক্রিপশনের কথা বলছেন আপনি? বিশেষ করে ওই ওষুধটা খুব কম লোকই কিনতে আসে এখানে।'

'জরুরী একটা ব্যাপারে সেই জেনেভা থেকে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে আসছি। উনি কি তোমাদের এখানে তাঁর লোকাল অ্যাড্রেস রেখে গেছেন?'

উত্তরে ভুরু জোড়া একটু কপালে তুলল তরুণ। 'আপনি কার কথা বলছেন? প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে দু'জন লোক এসেছিলেন, কেউই তাঁরা বুড়ো নন। মিস্টার মোহায়ের তাঁদেরকে ওষুধ বুঝিয়ে দেন, তবে আমি তাঁকে সাহায্য করি। প্রেসক্রিপশন ছিল লম্বা লোকটার কাছে, তাঁর হাত স্লিঙে ঝুলছিল। তুলো আর অ্যান্টিসেপটিকও কিনলেন। হয়তো বন্ধুর জন্যে। তাঁর মুখেও তো ব্যান্ডেজ দেখলাম। স্কি স্লোপ থেকে হরদম পড়ছে লোকজন, কাটাছেঁড়া রোজই দেখতে হয় আমাদের।'

'ডক্টর দানিশকে কোথায় পেতে পারি, একটা ধারণা দিতে পারো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, তা কী করে বলব। তবে ওরা যে গাড়ি করে এসেছিল সেটা আমি চিনি। ওটা ড্রাগনার স্কলস থেকে এনেছে ওরা। জায়গাটা ক্লস্টার্স-এর কাছাকাছি। বড় গাড়ি, ইংলিশ সিডান। প্রাইভেট যে-সব পার্টি স্কি মরশুমে পুরানো শ্যালেই ভাড়া নেয়, তাদেরকে এরকম একটা করে গাড়ি ব্যবহার করতে দেয়া হয়।'

মনের উত্তেজনা বাইরে চেপে রেখে ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে এল রানা। লেনাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি স্কিইং জানো?'

'জানি, তবে এক্সপার্ট নই।'

'চলো, একটা স্পোর্টস শপ থেকে দরকারী আউটফিট কিনে ফেলি।' তুষার পড়ছে, তার উপর দিয়ে হাঁটবার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য রানার একটা কনুই শক্ত করে ধরে থাকল লেনা।

কাছাকাছি একটা দোকান থেকে স্কি টগ সহ যা যা দরকার সব কিনল ওরা। হলুদ থ্রী-পিস আউটফিটে যে-কোন ম্যানিকিন-এর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল লেনা—ভেস্টটা প্যান্টের সঙ্গে চেইন দিয়ে জোড়া লাগানো, সঙ্গে আছে ম্যাচ করা লাইটওয়েট পারকা। রানা পছন্দ করল প্যাড লাগানো গাঢ় নীল রঙের জ্যাকেট, সঙ্গে একই রঙের কাভারঅল। এই রঙ বাছাই করবার পিছনে বিশেষ কারণ আছে রানার। দু'জনেই মাথায় হাতে বোনা ক্যাপ পরবে, হাতে দস্তানা, পায়ে ওয়াকিংবুট, চোখে চওড়া লেন্সের গগলস্। চোখ ধাঁধানো রূপ আর ফিগারের পাশে আশা করা যায় রানাকে কেউ বিশেষ খেয়ালই করবে না।

দোকানের সেলসম্যান খুব কাজে লাগল। হাত তুলে ডিসপ্লে বোর্ডটা দেখাল সে, তাতে সর্বশেষ স্কি কন্ডিশন তুলে ধরা হয়েছে। অনেক কাজের কথাই জানা গেল তার কাছ থেকে। ক্লস্টার্স-এর বেশিরভাগ ঢালে তুষার জমেছে কমবেশি চল্লিশ ইঞ্চি। মরশুমের শুরুতে এটা অনেক বেশি তুষার। তুষার এখন খুব শুকনো, এখনও জমাট বাঁধেনি। ফলে কন্ডিশন নাজুক হয়ে আছে। ঘন ঘন তুষার ধস হয়, এমন এলাকাগুলোকে এড়িয়ে থাকতে হবে ওদের। অবশ্য পোস্টেড এরিয়ায় থাকলে কোন ভয় নেই।

লোকটা এরপর একটা হোটেলের নাম বলল। 'বার্ন হাউস। বেশি পয়সা দিলে প্রাইভেট কটেজও ভাড়া পাওয়া যায়।' কার্ডের পিছনে একটা নাম লিখল। বলল, 'আমার বন্ধু ভলমার, ওই হোটেলের কর্মচারী—দেখবেন, কার্ডটা দেখালে কেমন খাতির করে।'

পারসেন পাহাড়শ্রেণীর তৈরি সরু একটু উপত্যকার গোড়ায় গড়ে উঠেছে মনোরম অ্যালপাইন গ্রাম ক্লস্টার্স। মেইন রোড থেকে অনেক পিছনে হোটেল বার্ন হাউস। ধনুকের মত বাঁকা একটা ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায়। ওদের কটেজে দুটো কামরা, পিছনের দেয়াল পাহাড়ী ঢালের গায়ে লেগে আছে। পাশের জানালা দিয়ে হোটেলের স্কি স্কুলে বাচ্চাদের ট্রেনিং নিতে দেখছে লেনা, তার পিছনে এসে উঁকি

দিয়ে বাইরে তাকাল রানাও। ওরা শিখছে বিগিনার'স স্লোপে। ঢালটার আরও সামনে কেবল্-এর ওপর ঝুলতে ঝুলতে এগোচ্ছে একটা গনডালা। তুষারের ভিতর হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল লেনা। চুলগুলো দু'হাত দিয়ে এলোমেলো করে মুখ বাঁকাল। সুযোগ পেয়ে রানা বলল, 'তুষার পড়া বন্ধ না হলে স্কি করতে যাচ্ছি না আমরা। যদি চাও তো হোটেলের বিউটি শপ থেকে এই সুযোগে একবার ঘুরে আসতে পারো।'

'সত্যি?' ভারী খুশি হলো লেনা। 'যাব? কিন্তু আপনি?'

'আমি যাই গ্রামটা একটু দেখে আসি।'

বিশ মিনিটের মধ্যে ক্লস্টার্সের প্রতিটি রাস্তা, গলি আর দরজা চিনে ফেলল রানা। সাধারণ একটা সুইস গ্রাম যেমন হয়, এটাও ঠিক তেমনি সাজানো-গুছানো। আঁকা ছবির মত। একটা দোকান থেকে শক্তিশালী লেন্স সহ পুরানো বিনকিউলার আর ক্যামেরা কিনল। শহরের কিনারায় পৌঁছাবার আগে একটা সাইবার কাফেতে ঢুকে রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার সঙ্গে আধ মিনিট কথা বলল।

রাস্তায় নেমে এসে দেখল মেঘ কেটে যাচ্ছে, রোদের প্রত্যাশায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। একটু পর তুষারপাতও বন্ধ হয়ে গেল।

রাস্তার শেষ মাথার দালানটাই গ্রামের চার্চ। একজন ট্যুরিস্টের মত এটা-সেটার ছবি তুলছে রানা। তারপর চোখে বিনকিউলার এঁটে পাহাড়ের ঢাল দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আসলে তিন মাইল দূরের ড্রাগনার শ্যালেই দেখছে।

পুবদিকের প্রধান সড়কটা প্রায় সমতলই। উপত্যকার গোড়া থেকে নিঃসঙ্গ একটা রাস্তা বেরিয়ে পাথুরে দালানটার দিকে চলে গেছে। দালানটা ঢালের পাঁচশো ফুট উপরে। রাস্তা থেকে খানিক আগে তুষার সরানো হয়েছে, সরিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে দু'পাশে। এক জায়গায় একটা স্তূপ কাত হয়ে ধসে পড়েছে রাস্তার উপর।

বাক্স আকৃতির পাথরের তৈরি দালানটার দিকে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে তাকাল রানা। চওড়া প্রাচীরের গায়ে কামান বসাবার ফাঁক দেখে বোঝা যায় ড্রাগনার শ্যালেইকে স্কলস বা দুর্গ বলা হয় কেন। খিলানের ভিতর উঠান বা চত্বরে পার্ক করা একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে, বেন্টলি সিডান বলে মনে হলো। ডক্টর মুবারকের প্রেসক্রিপশন ড্রাগনার শ্যালেই-এর একজন অতিথির কাছে ছিল, ডাভোস ফার্মাসিস্ট-এর তরুণ কর্মচারীর সেই অনুমান বোধহয় সত্যি।

বেশ কিছুক্ষণ ওদিকে নজর রাখল রানা। সব মিলিয়ে তিনজন লোককে দেখা গেল, তবে এত দূর থেকে কারও চেহারা চেনা সম্ভব হলো না।

বার্ন হাউস অর্থাৎ নিজেদের কটেজে ফিরল রানা। লেনা বিউটি শপ থেকে এখনও ফেরেনি দেখে একটা চিরকুট লিখে রেখে আবার বেরুল, এবার স্কি গিয়ারে সজ্জিত হয়ে।

সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে বটে যে নিরাপত্তার স্বার্থে পোস্টেড এরিয়ার

ভিতর থাকতে হবে, কিন্তু রানা যে কোর্স ধরবে বলে প্ল্যান করেছে তাতে বেসিক সমস্ত সেফটি রুলস অগ্রাহ্য না করে উপায় নেই। ওর কোর্স শুরু হলো উইসফ্লুহজক ঢালের মাথা থেকে। ওখানে পৌঁছাতে হলে দু'সেট কেবল্ কার-এর যে-কোন একটা ব্যবহার করতে হবে। চূড়া থেকে ক্লস্টার্সে ফিরবার সরল স্কি পথ ছ'মাইলের কিছু বেশি, উচ্চতা কমবেশি পাঁচ হাজার ফুট। মাঝামাঝি দূরত্বে অনেকগুলো উত্তেজনাকর বাঁক আছে, এক ঢাল থেকে আরেক ঢালে উড়ে যাবার সময় মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। তারপর ঘন জঙ্গলে ঢাকা ঢাল ধরে পথ সংক্ষেপ করে নেওয়ার প্রয়াস।

সূর্য নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াগুলো লম্বা হচ্ছে। ড্রাগনার শ্যালেই-এর উপর দিকে কোথাও পৌঁছাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল রানা। বেপরোয়া হয়ে ওঠায় দু'বার আলগা তুষারে ডুবে গেল, গভীরতা বেশি হলে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হত না। এসময়ই উপলব্ধি করল রানা, সেডরিক থান্ডারের গোপন আস্তানা খুব কাছ থেকে রেকি করবার চেয়ে নিরাপদে ফিরে যাওয়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত ঘনিয়ে আসা গোধূলিতে দুর্গটাকে পাশ কাটিয়ে এল ও, ছোটার মধ্যে লেআউট সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা পেল মাত্র। তিন স্তর নিয়ে বিশাল দুর্গটার এত বেশি জানালায় আলো দেখা গেল, বুঝতে অসুবিধে হয় না যে শ্যালেই-এর সবটাই ব্যবহার করছে থান্ডার।

লেনাকে কটেজে পাওয়া গেল না। রানার চিরকুটটা সে পেয়েছে, তা না হলে টেবিল থেকে ওয়েস্টবাস্কেটে গেল কী করে। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাচ্ছে রানা, এই সময় ফিরল সে। জেনেভা থেকে প্রকাশিত একগাদা দৈনিক পত্রিকা কিনে এনেছে।

ডিনারের জন্য কাপড় পরল রানা। পিস্তল সহ শোল্ডার হোলস্টার শার্ট আর জ্যাকেটের নীচে লুকানো থাকল। লেনাকে কী যেন বলতে যাবে ও, এই সময় মৃদু নক হলো দরজায়।

ঝট করে ঘুরল লেনা। 'আমি দেখছি,' বলেই হাত বাড়াল দরজার নব লক্ষ্য করে।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

কিন্তু এরইমধ্যে নব ঘুরিয়ে ফেলেছে লেনা, ল্যাচ রিলিজ হয়ে গেছে। দরজার কবাট বিস্ফোরিত হলো। বাড়ি খেয়ে ছিটকে রানার উপর পড়ল লেনা। পিস্তলটা বের করে এনেছে রানা, কিন্তু বাগিয়ে ধরে লেভেলে তুলে আনতে পারেনি তখনও, এই সময় একটা লম্বা, লোমশ হাত অ্যারোসল ক্যানের বোতামে চাপ দিল ওর মুখ লক্ষ্য করে।

স্প্রেটা বরফের মত ঠাণ্ডা। চোখে তীব্র জ্বালা। রানা এখন সম্পূর্ণ অন্ধ। কিছুটা স্প্রে নাক হয়ে গলাতেও পৌঁছেছে। লক্ষণটা হাঁপানি রোগীর মত, ইচ্ছের বিরুদ্ধে হাঁপাতে বাধ্য হচ্ছে ও। ফুসফুসে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকে রানার হাঁটু জোড়াকে যেন রাবার বানিয়ে দিল। পড়ে যাচ্ছে ও।

আট

চোখ খুলে মাথা ঝাঁকাল রানা, চেষ্টা করল ঝাপসা ভাবটা দূর করতে। মনে হলো. সামনে একটা গাছের কাণ্ড দেখছে।

সচল একটা গাড়ির ব্যাকসিটের মেঝেতে পিঠ দিয়ে শুয়ে রয়েছে ও। বাকলবিহীন গাছের কাণ্ড হয়ে গেল লেনার লম্বা সুগঠিত পা। তার দু'পাশে ট্রাউজার পরা দু'জোড়া পুরুষের পা দেখা যাচ্ছে, হাঁটু পর্যন্ত। যে সিটটায় ওরা তিনজন বসেছে সেটার শুধু কিনারা দেখতে পাচ্ছে ও।

জোরে একটা দম নিল রানা, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হতে যাচ্ছে। বুট পরা একটা পা লাথি মারল কাঁধে, কার্পেট মোড়া মেঝেতে মুখটা ঠুকে গেল। 'শান্ত হয়ে থাকো, রানা,' বলা হলো ওকে। 'এই তো, এসে পড়েছি।' জার্মান বাচন ভঙ্গি স্পষ্ট কানে বাজে।

গাড়িটা ছুটছে আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা ধরে। মসৃণ যাত্রা, কাজেই ধরে নিতে হয় চাকার নীচে কংক্রিট। উল্টোদিকে, অনেক উঁচুতেও, সাইড উইন্ডোর বাইরে তুষার সরিয়ে তৈরি করা স্তূপ দেখতে পাচ্ছে রানা।

গাড়ির স্পীড কমল। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক। তারপর ধনুকের মত বাঁকা পথ ধরে উপরদিকে উঠছে। কার্পেটে শোয়া অবস্থায়ও ড্রাগনার শ্যালেই-এর আকাশ ছোঁয়া ছাদের কিনারা দেখতে পেল রানা। সেটা অদৃশ্য হলো ড্রাইভার পাথুরে খিলানের ভিতর দিয়ে একটা চত্বরে ঢোকবার সময়। বড় একটা জায়গা নিয়ে বাঁক ঘুরল কার, তারপর থামল।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে গাড়ি থেকে বের করা হলো রানাকে। ইঙ্গিতে ভারী ওক কাঠের একটা দরজা দেখানো হলো।

লেনার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। তার দু'পাশে দু'জন পালোয়ান। এদের মধ্যে যার মুখে ব্যান্ডেজ, অকারণে টানা-হ্যাঁচড়া করে সেই লেনাকে শ্যালেইয়ের ভিতর ঢোকাল। একেবারে শেষ মুহূর্তে শরীরটা মুচড়ে রানার দিকে একবার তাকাতে পারল সে। চেহারায় হতবিহ্বল একটা ভাব।

তৃতীয় লোকটা ড্রাইভার। বড় একটা ক্যাপে কপালটা পুরো ঢাকা। বুনো ভালুকের মত শক্তি গায়ে। রানাকে সরু একটা প্যাসেজ আর ভারী আরেকটা দরজার ভিতর দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে এল। ছোট একটা উঠান। রানা এত দুর্বল আর দিশেহারা, দশ বছরের একটা বাচ্চাও ওকে অনায়াসে সামলাতে পারবে।

উঠানের মেঝেতে পাথর বসানো। জায়গাটা প্রায় চৌকো। সম্ভবত পার্কিং এরিয়া হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। দুটো ব্রিটিশ সিডান দেখল রানা, ওদেরকে যেটা বয়ে আনল হুবহু সেটার মতই। এরপর আলোকিত একটা প্যাসেজওয়েতে

ঠেলে দেওয়া হলো রানাকে। জায়গাটা যেন চওড়া ক্লজিট। হাবিজাবি অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে একটা র‍্যাকে স্কি আর স্কি পোল রয়েছে। একদিকের দেয়ালে জ্যাকেট, রেনকোট আর পারকা ঝুলছে।

কামরাটার শেষ মাথায় দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সেডরিক থান্ডার ওরফে আরবিটার, অলস ভঙ্গিতে সে তার সরু কালো চুরুট ধরাচ্ছে। উজ্জ্বল আলোয় এই প্রথম স্পষ্টভাবে তাকে দেখছে রানা। লোকটার চেহারায় লালচে একটা আভা আছে। চোখ দুটো কাছাকাছি। একটু যেন নেশাতুর। কপালটা চওড়া আর উঁচু।

'এখানে তোমাদের বেশিক্ষণ থাকতে হবে না,' জার্মান টানে ইংরেজিতে বলল থান্ডার। 'কতটুকু কী জানে, সেটা আমরা মেয়েটাকে ইন্টারোগেট করে জেনে নেব। মানে, তুমি যদি মুখ না খোলো আর কী।'

'ও কিছুই জানে না,' বলল রানা। 'আমাকে একটু সামলে নেয়ার সময় দাও, সব ব্যাখ্যা করছি।'

'আমাকে গর্দভ মনে কোরো না, মিস্টার রানা,' খেঁকিয়ে উঠল থান্ডার। 'প্রথমে মিস্টার আহমেদের সঙ্গে ছিল, এখন তোমার সঙ্গে। তারমানে তোমাদের দলের কেউ।'

'ও সাধারণ একটা নিরীহ মেয়ে, আরবিটার,' বলল রানা। 'তুমি যে-সব কথা জানতে চাও তার কিছুই জানে না ও।'

'তা হলে জবাব দাও, মেয়েটা তোমার সঙ্গে ঘুরে বেরাচ্ছে কেন, বিপদ মাথায় করে?'

উত্তর দিতে রানা দেরি করছে দেখে হাসল আরবিটার। 'তোমার চাতুরী ধরা পড়ে গেছে, হে। মেয়েটা তোমাদের সহকারিণী। যাও, সিনিয়ার বন্ধুর হাল-হকিকত দেখে এসো।' চুরুট ধরা হাতটা নেড়ে ভালুক অর্থাৎ ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে: 'ওকে টারিট রুমে নিয়ে যাও।'

ভালুকের হাত বারবার ধাক্কা দিল রানার পিঠে। সাজানো-গোছানো অনেকগুলো বড় কামরার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। ঘাড় ফিরিয়ে তার অপর হাতে একটা পিস্তল দেখল রানা।

থান্ডার আর তার গুণ্ডারা এই দুর্গে বেশি সময় থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। ধুলো না লাগার জন্য ফার্নিচারের উপর যে আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর একটাও সরানো হয়নি। বিশাল আকৃতির ফায়ারপ্লেসগুলো দেখে মনে হলো না সম্প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। থান্ডার যে প্ল্যানই করে থাকুক, সেটা খুব বেশি সময় নেবে না।

বাঁকা হয়ে উপরে উঠেছে সিঁড়িটা। দু'তলায় ওঠার সময় পা দুটো সীসার মত ভারী লাগল। ইঙ্গিতে একটা হলওয়ে দেখানো হলো ওকে। শেষ মাথায় আরেক প্রস্থ সিঁড়ি থাকায় উঠতে হচ্ছে।

তিনতলার সিলিং বেশি উঁচু নয়। পিঠে আবার ভালুকের লোমশ হাতের ধাক্কা খেয়ে শ্যালেইয়ের বাইরের পাঁচিলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল রানা। ইঙ্গিতে

আরেকটা করিডর দেখানো হলো ওকে। এটার শেষ মাথায় ভারী ওক কাঠের দরজা।

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল ভালুক। গলা থেকে ঘর্ঘরে আওয়াজ বের করে নির্দেশ দিল। ঘুরল রানা। পিছু হটল। ভালুকের ছুঁড়ে দেওয়া বড়সড় চাবিটা ঠিকমতই ধরল। তারপর দরজার তালা খুলল।

তালায় চাবি রেখে কামরার ভিতর ঢুকল রানা। এক মুহূর্ত পর ওর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তালায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ হলো।

কামরাটা গোল। মাথার কাছাকাছি নিঃসঙ্গ জানালা দিয়ে ভিতরে উজ্জ্বল রুপোর মত চাঁদের আলো ঢুকছে। ডায়ামিটারে পনেরো ফুট হবে, এটা একটা সেল। প্রথমেই রানার খুব ঠাণ্ডা লাগল। কামরাটায় হিটিং সিস্টেম রাখা হয়নি। বুকে হাত বাঁধল রানা, কাঁধ দুটো উঁচু করল।

দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকা চাদর বা কম্বলের একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। দ্রুত পা ফেলে সেদিকে এগোতে রানা দেখল, তা নয়, ছেঁড়া তোষকে গা মুড়ে একটা লোক পড়ে রয়েছে।

রানা ভাবল লোকটা মারা গেছে। চোখ খোলা, অথচ মণি নড়ছে না। গাল দুটো শুকনো আর গর্তে ঢোকা। ঠোঁটে কোন রঙ নেই। বয়স আশির কাছাকাছি।

অনেক কষ্টে মাথা উঁচু করে রানার দিকে তাকালেন বুড়ো মানুষটা। 'আপনি এসেছেন,' দুটো শব্দ উচ্চারণ করতেই হাঁপিয়ে উঠলেন। 'আমি জানতাম আপনি আসবেন। নানা সূত্রে আমি জেনেছি, আপনি দায়িত্ব এড়াবার মানুষ নন।'

'ডক্টর দানিশ মুবারক?'

কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে রানার কব্জি চেপে ধরলেন বৃদ্ধ। 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করলেন। 'আমি জানতাম আপনি আমাকে হতাশ করবেন না।' আরেকজন মানুষের স্পর্শ নিয়ে তিনি যেন নিজের নিস্তেজ শরীরে শক্তি পেতে চাইছেন। তবে যুক্তি দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারছেন না।

'আপনি আমাকে জানাতে এসেছেন–,' থেমে গেলেন ডক্টর দানিশ, ভাব দেখে মনে হলো স্মরণ করবার চেষ্টা করছেন কী মেসেজ তাঁর পাবার কথা।

কিন্তু রানা কোন মেসেজ নিয়ে আসেনি। নিয়ে যদি এসে থাকে তো একগাদা প্রশ্ন, কিন্তু সে-সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর আছে বলে মনে হচ্ছে না। বাস্তব পরিস্থিতি হলো, আরও একটা কানাগলিতে পৌঁছেছে রানা। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে ডক্টর দানিশের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় একই কামরায় ওকে থাকতে দিয়েছে থান্ডার। সে ভাল করেই জানে ডক্টর দানিশের যে করুণ অবস্থা, তাঁর কাছ থেকে কোন তথ্যই পাবে না ও। তবু, রানাকে চেষ্টা করতে হবে।

'যা জানি সবই আপনাকে বলব,' প্রতিশ্রুতি দিল রানা, হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মাথার দিকে ঝুঁকল। 'কী জানতে চান আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করুন। প্লিজ।'

'তামান্না–আমার মেয়ে–তামান্না। আপনি তাঁকে পেয়েছেন?' তাঁর থাবার মত মুঠো রানার বাহুতে আরও শক্ত হলো।

কিছু বলবার মত জানা থাকলে তো জবাব দেবে রানা। চিন্তা করে দেখল, প্রথমে নিজের পরিচয় জানিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ দূর করা দরকার। 'মিস্টার মুবারক, আমি রেদোয়ান আহমেদ নই। আমার নাম মাসুদ রানা। আমি ওমর খৈয়মের ভক্ত। আপনাকে নিতে এসেছি।'

বৃদ্ধ বিজ্ঞানী রানাকে ধরে উঠে বসলেন, তারপর ওর গায়েই হেলান দিয়ে থাকলেন। 'মিস্টার রেদোয়ান মিস্টার মালিকের মাধ্যমে কথা দিয়েছিলেন। আমরা একমত হই: আমার মেয়ে তামান্নাকে আপনারা গোপনে বের করে আনবেন ইরাক থেকে, তারপর প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করবেন।' থেমে ঘন ঘন হাঁপালেন বিজ্ঞানী। 'প্রথমে আমাকে জানতে হবে, তারপর বলব কোথায়–কোথায়–কোথায়–' চরম ক্লান্তিতে ঢলে পড়লেন তিনি।

'কোথায় কী?' রানার কণ্ঠে প্রায় অনুনয়।

অর্থহীন, শূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর দানিশ।

'কোথায়। আপনি বলছিলেন, আমাকে বলবেন কোথায়। কী কোথায়?' তাঁর ঘুমন্ত মনটাকে জাগাবার চেষ্টা করছে রানা।

'তামান্না কোথায়? আমার মেয়ে?' প্রসঙ্গ ফিরে পেয়ে সাড়া দিলেন বৃদ্ধ। 'আপনারা তাকে নিরাপদে রেখেছেন। চলুন, আমরা তাকে দেখে আসি। না, আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব নয়...'

'আপনি বোধহয় রোশনির কথা বলছেন।'

'রোশনি?' মনের ভিতর তল্লাশী চলছে, চোখ সরু করে রানাকে খুঁটিয়ে দেখছেন তিনি। 'হ্যাঁ, তারও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন আপনারা। তার আর আহসানের। এবং তামান্নারও। হ্যাঁ, তামান্নারই বেশি কেয়ার দরকার।' ডক্টর দানিশ এতই দুর্বল যে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারছেন না। যাও বা বলছেন, বোঝা মুশকিল কোনটা কথা, কোনটা প্রলাপ।

চোখ বুজলেন তিনি, আরেকবার মনে হলো মারা গেছেন। বাহু থেকে তাঁর জরাগ্রস্ত হাতটা ছাড়িয়ে, শরীরটা ধরে ভাল করে শুইয়ে দিল রানা, তারপর নোংরা, ছেঁড়া একটা কম্বল টেনে দিল গায়ে।

ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য পায়চারি শুরু করল রানা, হাত দুটো ঘড়ির দোলকের মত দোলাচ্ছে। তৃতীয় চক্কর শেষ করতে যাচ্ছে, এই সময় বিস্ফোরিত হয়ে খুলে গেল দরজা।

বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভালুক। তার পিছনে থান্ডার। থান্ডারের হাতে একটা মেশিন পিস্তল। সে মাথা ঝাঁকাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল ভালুকের শরীরে। রানার ডান কব্জিটা ধরে ফেলল সে। নড়াচড়ায় বিরতি না দিয়ে হাতটা বাঁকা করে তুলে ফেলল ওর শিরদাঁড়ার কাছে। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল রানা।

প্রথমে করিডর, তারপর সিঁড়ি ধরে ওকে তারা একটা বেডরুমে নামিয়ে আনল। ডাবল বেডে শুয়ে রয়েছে লেনা, পা আর হাত দু'দিকে প্রসারিত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। একটা সুতোও নেই শরীরে। তার ছেঁড়া কাপড়চোপড়

চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ব্রেসিয়ারটা মুখের ভিতর গোঁজা। সারা গায়ের অসংখ্য ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। কিছু ক্ষত আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়ার ফল; ফোস্কা পড়েছিল, তারপর গলে গেছে। মুখের ভিতর কাপড় থাকাতেই তার চিৎকার শুনতে পায়নি রানা।

প্রচণ্ড ক্রোধে অন্ধ হয়ে সামনে এগোল রানা। কিন্তু ভালুক হাতটা আরও একটু মুচড়ে দিতে গুঙিয়ে উঠে থেমে গেল।

হেঁটে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল থান্ডার, রানা যাতে দেখতে পায় তাকে। 'বুঝতেই পারছ, মিস্টার রানা, বেশ্যাটা সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি। প্রথমে খুব তেজ দেখালে কী হবে, শেষ দিকে এখন বারবার খালি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। তুমিই বলো—নড়েচড়ে না, এমন কাউকে নিয়ে ফুর্তি করা যায়?'

'বাস্টার্ড! তোকে না তখন বললাম, মেয়েটা কিছু জানে না?'

'মিস্টার রানা আমার বন্দি হয়ে আমাকেই গাল দিচ্ছে,' ভালুকের দিকে তাকিয়ে বলল থান্ডার। 'তারমানে বোধহয় সত্যি কথাই বলছে। কি বলো?' ফিরল আবার রানার দিকে। 'ঠিক আছে, মিস্টার রানা, ওর অবস্থা একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নাও তুমি। সহযোগিতা না করলে তোমারও ঠিক এই অবস্থা হবে।'

'ওকে ছেড়ে দাও, থান্ডার!' গর্জে উঠল রানা।

'তারমানে তুমি সহযোগিতা করতে রাজি? আমাকে এখন জানাবে ফর্মুলাটা কীভাবে আমি উদ্ধার করতে পারব?'

'ছেড়ে দে ওকে, হারামজাদা!' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল রানা।

এই চিৎকার শক্তি জড়ো করবার জন্য। পরমুহূর্তে ঠিক যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। এক ঝটকায় ভালুকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করল ও, তারপর এক লাফে পৌঁছে গেল তৃতীয় লোকটার কাছে। লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল লেনার পায়ের কাছে। ওর পাশ কাটিয়েই পৌঁছতে হবে রানাকে থান্ডারের কাছে।

পা চালাল রানা। স্টীল ক্যাপ লাগানো জুতোর ডগা বিস্মিত লোকটার তলপেট প্রায় ফাটিয়ে দিল। মেঝেতে পড়ে গোঙাচ্ছে সে। এই সময় রানার কোমরে প্রচণ্ড এক লাথি মারল ভালুক। লাথিটা বিছানার দিকে ঠেলে দিল রানাকে। ওখানেই পৌঁছাতে চাইছে ও, কিন্তু তার আগেই ল্যাঙ খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

'মিস্টার রানা!' থান্ডারের চিৎকার ঘুসির মতই আঘাত করল রানাকে। 'এদিকে! এদিকে তাকাও!'

মেঝে থেকে উঠে বসছে রানা। হাঁটুর উপর উঁচু হবার সময় বিছানার আরেকপ্রান্তের দিকে তাকাল। হাতের মেশিন পিস্তলটা লেনার কপালে ঠেকিয়ে রেখেছে থান্ডার, মাথার চুল যেখানে ঘামে ভেজা কপালে লেপ্টে আছে।

এই মাত্র জ্ঞান ফিরেছে লেনার। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত, হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

দাঁড়াল রানা। কাঁপছে থরথর করে। একজন পরাজিত মানুষ। থান্ডারের চোখে-মুখে ফুটে ওঠা উল্লাস এত অসহ্য লাগছে, মনে হলো পেটের ভিতর যা কিছু আছে সব গলায় উঠে আসবে। থান্ডারের দিকে গভীর মনোযোগ থাকায় ভাল করে টেরই পেল না ভালুক আবার ওকে পেঁচিয়ে ধরেছে।

পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করল থান্ডার, পিছিয়ে গেল আধ পা। রানা ভাবতেই পারছে না, বিনা কারণে এভাবে কেউ অসহায় একটা মেয়েকে গুলি করতে পারে। কিন্তু থান্ডারের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে বুনো কী যেন একটা দেখে শিউরে উঠল ও।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল মেশিন পিস্তলের গর্জনে। ঝাঁকি খেয়ে আরেকদিকে ঘুরে গেল লেনার মাথা। হাড়, রক্ত আর মগজ মিলেমিশে একাকার হয়ে বিছানা থেকে মেঝেতে পড়ছে।

নারকীয় দৃশ্যটা দেখে বমি পাচ্ছে ভালুকের। একটু ঢিল অনুভব করল রানা। ডান পায়ের জুতো দিয়ে তার পায়ের কয়েকটা আঙুল থেঁতলে দিল ও। তারপর ঘুরে গেল, বাঁ পায়ের ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল ওর পেটে।

নিজেকে মুক্ত করে দরজার দিকে ফিরল রানা, দেখল আরও দু'জন ঢুকছে বেডরুমে।

উপায় নেই, ওই দরজা দিয়েই বেরুতে হবে রানাকে। ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রস্তুতি নিচ্ছে, দু'জন লোকই ওর দিকে অদ্ভুতদর্শন হ্যান্ডগান উঁচিয়ে পয়েন্টব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ফায়ার করল। বুকের বাম পাশে তীক্ষ্ণ একটা জ্বালা অনুভব করল রানা।

চোখ নামিয়ে তাকাল ও। একটা ছোট্ট, খুদে বর্শা সরাসরি ওর বুক থেকে বেরিয়ে আছে। ফাঁপা সুচের আগা থেকে বেরনো ট্র্যাঙ্কুইলাইজার এরই মধ্যে ওর দৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়েছে। মাথাটা তিন মণ ভারী হয়ে গেল। দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল মাসুদ রানা।

নয়

জ্ঞান ফিরবার পর চোখ মেলতে রানা দেখল ওর উপর ঝুঁকে রয়েছে একটা টাক মাথা। দৃষ্টি আরও খানিক পরিষ্কার হতে ডক্টর দানিশকে কোন রকমে চিনতে পারল, দুর্বল হাতে ওর মাথাটা ধরে একটা ভাঁজ করা কম্বলের উপর তুলতে চেষ্টা করছেন।

'আ-আমি ভাল আছি।' গলার আওয়াজ নিজের বলে চেনা যাচ্ছে না।

ওর মুখের সামনে একটা হাতের আঙুল মেলে ধরলেন বৃদ্ধ। রানাকে দিয়ে ওগুলো যদি গোনাতে চান তাঁকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ওর দৃষ্টি

এখনও ঝাপসা, অস্পষ্ট আকৃতিই শুধু অতি কষ্টে ঠাহর করতে পারছে। কিন্তু ডক্টর দানিশ নাছোড়াবান্দার মত ওর হাতে খোঁচা মারছেন। 'ওরা আপনাকে এই জিনিস দিয়েছে,' বললেন তিনি।

ভাল করে দেখবার জন্য চোখ টান টান করল রানা। দু'ইঞ্চি লম্বা একটা খুদে বর্ষার লেজ ধরে আছেন তিনি, মাথার দিকটা সিরিঞ্জের সুচের মত ফাঁপা। রানা হাত বাড়াতে যাচ্ছে দেখে নাগালের বাইরে সরিয়ে নিলেন। 'সাবধান। এখনও এটা লোড করা। এটা আমি আপনার জ্যাকেটের শোল্ডার প্যাডিং-এ গাঁথা অবস্থায় পেয়েছি। প্রথমটা আপনার বুকে লেগেছিল।' বিজ্ঞানী ভদ্রলোক রানার একটা হাত গাইড করলেন, সুইয়ের মত তীক্ষ্ণ ডগা যাতে কোথাও বিঁধে না যায়। খুদে বর্শাটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন। 'এটা আপনাকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করতে পারে,' বললেন তিনি।

মাথাটা ঠিক মতই কাজ করছে, কথাটার তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধে হলো না। ডক্টর দানিশ ঠিকই বলেছেন। থান্ডারের লোকজন সার্চ করে পিস্তল আর ছুরিটা নিয়ে গেছে। ও এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। 'ক'টা বাজে?' কণ্ঠস্বর এখনও কর্কশ। সেলের ভিতর ম্লান আলো, দেখে বোঝা যাচ্ছে না ভোর না সন্ধ্যা।

'এই তো, রাত পোহাচ্ছে।'

'যেভাবে হোক এখান থেকে বেরুতে হবে আমাদের,' সিদ্ধান্ত নিল রানা, কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। মেঝেটা মনে হলো এদিক ওদিক কাত হচ্ছে। ডক্টর দানিশ ওকে ধরে সিধে করে রাখলেন।

'না,' বললেন তিনি। 'একা শুধু আপনি। কোথাও যাবার মত অবস্থা আমার নেই।'

কথাটা বাড়িয়ে বলা নয়। তবে তাঁর মাথা এখন আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। কী বলছেন জানেন। তবু রানা তাঁকে পরীক্ষা করল। 'আমাকে আপনার মনে আছে, তাই না? কাল রাতে আমরা কথা বলেছি।'

'হ্যাঁ। তা কি গত রাতে? আমার পারিবারিক বিষয়ে আলাপ হয়। আপনি বললেন, রোশনিকে দেখেছেন। সে ভাল আছে।'

'আপনার বড় ভাই মিস্টার আহসানুল মুবারককেও দেখেছি,' বলল রানা। 'ওদের সঙ্গে প্যারিসে ছিলাম আমি। আপনি নিশ্চিত থাকুন, দু'জনেই খুব ভাল হাতে পড়েছেন।' রানার বিবেচনায়, ওর বক্তব্য সত্যের বরখেলাপ নয়।

বিজ্ঞানীর ম্লান ঠোঁট প্রসারিত হলো, সেখানে দুর্বল একটু হাসি ফুটতে দেখল রানা। 'আমি খুশি,' বললেন তিনি। 'আর ফ্রেঞ্চ মেয়েটা? এতদিনে নিশ্চয়ই হাসপাতাল ত্যাগ করেছে—হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনি লেনার কথা বলছেন? খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে সে,' বলল রানা, ভাবাবেগ ঠেকিয়ে রাখবার জন্য গলার আওয়াজ একটু কঠিন করতে হলো। 'তিন দিন হলো প্যারিসে ফিরেছে।' হাঁটুর উপর সিধে হলো ও, কম্বলটার ভাঁজ খুলে জড়িয়ে দিল অসুস্থ বিজ্ঞানীর গায়ে। 'এখন শরীরটা ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ, ভাল আছি। ওরা আমাকে আমার ওষুধ দিয়েছে। রাতে, আপনাকে যখন ওরা পরীক্ষা করে গেল, তখন। ওষুধটায় কাজ হয়, বুঝলেন। কাজ হয় মানে কিছুটা সময় ভাল থাকি। তবে যত দিন যাচ্ছে, ওই ভাল থাকার সময়টা ছোট হয়ে আসছে। ডাক্তাররা বলছে···তা ওরা যা খুশি বলুক, আমি জানি এরপর কোন ওষুধেই আর কোন কাজ হবে না।' ধীরে ধীরে কথা বলবার সময় খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন রানাকে। 'আপনি এখানে এলেন কেন?' একেবারে শেষে জানতে চাইলেন তিনি।

'আপনার খোঁজে।'

'কেন? লেনার কাছে তো চাবি আছেই, আর তামান্নাও অপেক্ষা করছে জায়গামত। আমাকে আপনার আর দরকারই তো নেই।' হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরলেন ডক্টর দানিশ। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল মুখ।

ওঁকে একটু সামলে নেওয়ার সময় দিয়ে রানা বলল, 'মিস্টার রেদোয়ান আহমেদ এদের হাতে খুন হয়েছেন। আপনার ভাই আহসান বা ভাইঝি রোশনি তো তামান্নার কথা কিছুই বলেনি আমাকে।'

'কেন বলবে!' কাতর স্বরে বললেন বিজ্ঞানী। 'ওরা তো জানে তামান্না ইরাকে। তামান্নার আকদ্ হয়েছিল, ছেলেটা মার্কিন সৈন্যদের হাতে খুন হবার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে মেয়েটা। সেজন্যেই তো আমি শর্ত দিই ইরাক থেকে ওকেও বের করে আনতে হবে।'

'এক মিনিট,' বলল রানা, টলমল পায়ে সিধে হলো। সেলের ভিতর এমন কিছু নেই যেখানে গোপন মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখবে, তবে দরজার কান পাততে পারে কেউ। মোটা ওক কাঠের কবাটে ফুটো-ফাটা কিছু না থাকলেও, দেখা গেল নীচের দিকে আধ ইঞ্চি ফাঁক রয়েছে। ওটা গলে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ভিতরে।

মুখের একটা পাশ মেঝেতে ঠেকিয়ে দরজার বাইরেটা দেখতে চেষ্টা করছে রানা। হলওয়ের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। দরজার সামনে কেউ নেই। দরজার উল্টোদিকে, করিডরে, বুট পরা একজোড়া পা হাঁটু পর্যন্ত দেখা গেল। রানা ধারণা করল, ভালুকটা ডিউটিতে ফিরে এসেছে।

নিচু করা মাথায় রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়াতেই সম্ভবত, হঠাৎ অনেক ধাঁধার সমাধান পেয়ে গেল রানা। লেনাকে নিয়ে বিজ্ঞানীর প্রশ্ন তোলাটা অলস বা বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের কারসাজি বা প্রলাপ নয়। ঝট করে মাথা তুলে ডক্টর দানিশের দিকে তাকাল রানা। কুঁজো হয়ে রয়েছেন উনি, এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছেন। দরজার ফাঁকে একটা কম্বল গুঁজল ও, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর পাশে চলে এল। কথা বলল নিচু গলায়।

'আপনারা দু'জন যখন একই সময়ে জেনেভায় ছিলেন, চাবিটা তখনই লেনাকে দেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। মিস্টার মালিকের মাধ্যমে এই নির্দেশ মিস্টার রেদোয়ানই তো পাঠিয়েছিলেন: আমি ফুলের দোকানদারকে নামটা বলি, সে যাতে এনভেলাপে সেটা লিখতে পারে। কার্ডের বদলে, ওটার ভিতর আমি চাবিটা ভরে দিই। ঠিক তিনি যেরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্ল্যানটা খুব বুদ্ধি করে করা হয়–প্রথমে তিনি তাকে হাসপাতালে পাঠালেন, পরে তাঁর নামে মেয়েটিকে আমি ফুল পাঠালাম। পরস্পরকে দেখার দরকার হয়নি। দু'জনেই আমরা সেফ ছিলাম।' তাঁর শেষ কথাটা কাতর গোঙানির মত শোনাল। উনি বোধহয় আর পারছেন না।

রানার ভয় হলো এখনি বুঝি তাঁকে হারাল। কাঁপুনিটা চোখে পড়বার মত। অথচ গায়ে দুটো কম্বল থাকায় ঠাণ্ডা লাগবার কোন কারণ নেই। 'সেফ', শব্দটা খেই হিসাবে ধরল রানা। 'একটা সেফ ডিপোজিট বক্সের চাবি।'

বিজ্ঞানীর চিবুক কাঁপতে শুরু করল। 'হ্যাঁ। আমার নোটগুলো। ওখানে নিরাপদে আছে...ব্যাঙ্কের বক্সে...তামান্নার নামে ভাড়া করা বক্স।' গড়িয়ে রানার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন তিনি, পাঁজরের একটা দিক খামচে ধরলেন।

'চলে যান! যেভাবে পারেন বেরিয়ে যান এখান থেকে!' চিৎকার করছেন, কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা। তারপরই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। গড়িয়ে দরজার দিকে চলে আসছেন তিনি। 'বেরোন এখান থেকে!' আবার বললেন তিনি। খিঁচুনি শুরু হওয়ায় পা দুটো ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে মেঝেতে।

দরজায় চাপড় মারছে কেউ। 'কী ব্যাপার? হল্লা কীসের?' ভালুকের কর্কশ গলা ভোঁতা শোনাল। ডক্টর দানিশ আবার আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর মুখ থেকে ফেনা গড়াতে দেখল রানা।

ধাতব একটা শব্দ হলো। তালায় চাবি ঢোকাচ্ছে ভালুক। 'পিছু হটো!' নির্দেশ দিল সে। বাইরের ল্যাচ ধাতব শব্দ করল। দরজার তালায় গোঁজা কম্বল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কবাট ফাঁক করা যাচ্ছে না। 'ঘটনাটা কী? দরজা খুলছে না কেন?' রেগেমেগে জানতে চাইল দৈত্যাকার ভালুক। 'আমাকে ঢুকতে দাও!'

'বুড়ো ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর খিচুনি উঠে গেছে,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। অবস্থা খুবই খারাপ, যন্ত্রণায় ভয়ানক ছটফট করছেন ডক্টর দানিশ। নিজের উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। চোখের মণি উল্টে গিয়ে মাথার ভিতর দিকে হারিয়ে গেল। 'আর দরজা জ্যাম হয়ে গেছে। জোরে ধাক্কা দাও!'

দৈবাৎ পাওয়া সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইছে রানা। দরজার ফাঁকে গোঁজা কম্বলের অপরপ্রান্তটা ওর এক হাতে। অপর হাতটা গোল পাকানো মুঠো, তা থেকে বেরিয়ে আছে ট্র্যাঙ্কুইলাইজার ভর্তি খুদে বর্শাটা।

এই সময় আরেকটা কণ্ঠস্বর কানে এল। থান্ডার আসছে। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠস্বর জোরাল হলো। পরিস্থিতি খানিকটা বিরূপ হয়ে ওঠায় প্ল্যানটা বদল করতে হলো রানাকে।

ওদের গলার আওয়াজ হঠাৎ কমে এল। কথা বলছে নিচু গলায়, তবে দরজার দিকে আরও এগিয়ে আসছে। ফিসফিসে আলাপ সরে এসেছে দরজার

একেবারে গায়ের কাছে। হাতে ধরা কম্বলে টান দিল রানা। দরজার নীচের ফাঁক থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সেটা।

ছোঁ দিয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে দরজার কবাট খুলে হলওয়েতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। বিস্ময় আর চমক সাহায্য করল ওকে। থান্ডার ও ভালুকের উপর বিনামেঘে বজ্রপাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। হাত দুটো এতই ক্ষিপ্র, ঝাপসা দেখাল ওগুলোকে। থান্ডারের বুকে প্রয়োজনের চেয়ে জোরে ছোট্ট বর্শাটা বেঁধাল রানা। ওর অপর হাতের কিনারা বিদ্যুৎগতিতে আঘাত হানল হতবিহ্বল ভালুকের কণ্ঠনালীতে। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল ভয়েস বক্সের থাইরয়েড কার্টিলিজ। ছিটকে মেঝেতে পড়ল দৈত্যের মত লোকটা, শ্বাস নেওয়ার জন্য ছটফট করতে করতে গড়িয়ে সরে গেল আরেকদিকে। হাত থেকে খসে পড়েছে পিস্তল।

থান্ডার নড়ল না। মাথা নত করে আছে। মুখটা রঙ হারিয়ে ফেলছে। অর্ধনমিত চোখ দিয়ে বুকে গাঁথা বর্শাটা দেখছে। হঠাৎ তার বাম পা ভাঁজ হয়ে গেল। দুই সেকেন্ড এক পায়ে ভর দিয়ে থাকল, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে ঢলে পড়ল মেঝেতে। সেখান থেকেও অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে রানাকে দেখছে সে। দেখল যতক্ষণ না বুজে এল চোখের পাতা।

সরে এসে ভালুকের পাশে হাঁটু গাড়ল রানা। গরিলার চোখ দুটো খোলা, তবে স্থির দৃষ্টি চকচক করছে। লোকটা কথা বলতে পারবে না, তবে এখন আর তাতে কিছু আসে যায় না। ভাঙা ডইন্ডপাইপ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলেছে তাকে।

ডক্টর দানিশের কাছে ফিরে এল রানা। শান্ত হয়ে শুয়ে আছেন, তবে মারা যাননি। খিচুনি তাঁর অবশিষ্ট শক্তি কেড়ে নিয়েছে, ফলে কোমায় চলে গেছেন তিনি। শরীরটা গরম রাখবার ব্যবস্থা করল রানা, কম্বলগুলো ভাল করে জড়িয়ে দিল গায়ে।

আরবিটার আর ভালুকের মধ্যে আরবিটারই বেশি লম্বা, আকার-আকৃতিতে রানার কাছাকাছি। তাকে ঠেলে কাত করল ও, গায়ের জ্যাকেটটা খুলে নিচ্ছে। আড়ষ্ট শরীর কাজটায় দেরি করিয়ে দিচ্ছে রানাকে। শেষ একটা টান দিয়ে প্যাড লাগানো জ্যাকেটটা খুলে নিল ও, এই সময় চকচকে কী যেন একটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। দেখেই জিনিসটা চিনে ফেলল রানা। লেনার গলার সেই সোনার চেইনটা। ইস্পাতের চাবি এখনও ওটার সঙ্গে আটকানো। তুলে ট্রাউজারের পকেটে রেখে দিল রানা।

ভালুকের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল। দ্রুত হাতে পরল থান্ডারের জ্যাকেট। ওর কাছ থেকে থান্ডারের মাথা মাত্র বারো ফুট দূরে। এই দূরত্ব থেকে একটা পোস্টেজ স্ট্যাম্প ফুটো করতে পারে ও।

কিন্তু তাতে শব্দ হবে। শ্যালেইতে শুধু থান্ডার আর ভালুকই নয়, আরও অনেক লোক আছে।

প্রথমে মনের ঝাল মিটিয়ে আরবিটারকে কষে কয়েকটা লাথি মারল রানা

গলায় পা দিয়ে মারবে, কিন্তু তার আগে জ্ঞান ফিরাতে চায়। নিথর পড়ে রইল থান্ডার, নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই।

আর দেরি করা যায় না। বাধ্য হয়ে পিশাচটার গলায় পা তুলে দিল রানা। এই সময় সিঁড়িতে দ্রুত উঠে আসার শব্দ পেয়ে চমকে উঠল ও।

হলওয়ের শেষ মাথায় সিঁড়িটা, প্রায় অন্ধকার ধাপ বেয়ে কে যেন উঠে আসছে। রানার সামনে দুটো পথ। সেলে ঢুকে পড়তে পারে ও, লোকটা তা হলে ওকে দেখতে পাবে না, তবে অনড় পড়ে থাকা দুটো শরীর ঠিকই দেখতে পাবে। দ্বিতীয় উপায় হলো, লোকটার সামনে যাওয়া। মুহূর্তের জন্য হলেও ওকে যদি থান্ডার বলে ভুল করে লোকটা, বিরাট সুবিধে পেয়ে যাবে ও।

সিঁড়ির দিকে ছুটল রানা, দেয়াল ঘেঁষে। কিন্তু ততক্ষণে প্রায় উঠে এসেছে লোকটা।

পরস্পরকে একই সময়ে দেখল ওরা। লোকটা তৈরি। সরু সিঁড়িতে তার গুলির আওয়াজ দশগুণ জোরাল শোনাল। রিফ্লেক্স অ্যাকশন থেকে করা গুলি দিকভ্রান্ত হলো, গভীর আঁচড় কাটল করিডরের দেয়ালে। তার দ্বিতীয় বুলেটটা মাথার সরাসরি উপরে সিলিঙে লাগল, কারণ কপালে স্মাইসারের একটা নাইন এমএম বুলেট নিয়ে এরই মধ্যে সটান পিছনদিকে আছাড় খেতে শুরু করেছে সে। কাঠের সিঁড়িতে দড়াম করে জোর আওয়াজ হলো।

ল্যান্ডিঙের লাশটা টপকে ধাপ বেয়ে নামছে রানা। গ্রাউন্ড লেভেলের মেঝে অন্ধকার। জানালার ভারী পর্দাগুলো ভোরের আলো ভিতরে প্রায় ঢুকতেই দিচ্ছে না। গুলির আওয়াজ হওয়ার পর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে না পারলে দুর্গটা ওর জন্য মৃত্যুফাঁদ হয়ে উঠবে। ওর এখন একমাত্র কাজ সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। প্রথমে বাইরের দিকের উঠানটায় পৌঁছাতে হবে ওকে, যেখানে গাড়িগুলো পার্ক করা আছে।

চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে। অনেক লোক। সবাই উত্তেজিত। কেউ একজন কর্তৃত্বের সুরে নির্দেশ দিল। আওয়াজ ভেসে আসছে রানা যেদিকে যেতে চায় সেদিক থেকেই। একপাশে সাজানো সোফা আর কফি টেবিলকে পাশ কাটিয়ে জানালার সামনে চলে এল। পর্দা সরাতে চোখ পড়ল পাকা চত্বরে। গাড়ি তিনটের পাশে চারজন লোক রয়েছে। সবার পরনে গরম পোশাক। দু'জনের কাঁধ থেকে স্টেনগান ঝুলছে।

লোকগুলো দ্রুত কথা বলছে। কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে একজন, সবার মনোযোগ ধরেও রাখতে পারছে। লোকটা থান্ডারের ডান হাত। তার মুখের পাশে ব্যান্ডেজ বাঁধা। থান্ডারের কাছ থেকে নির্দেশ পাক বা না পাক, এই লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রানার চলে যাওয়া দেখবে না। ওর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ জন্মাবার কারণ আছে তার।

দু'জন করে দু'দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। এক স্টেনগানধারী নিরস্ত্র এক গুণ্ডাকে নিয়ে গাড়িগুলোর কাছে থাকবে, অপরজন দ্বিতীয় লোকটাকে নিয়ে ঢুকবে

ভিতরে। দুটো বেন্টলির হুডের পিছনে আড়াল নিল বাইরের দুজন, উঠানে কাউকে ঢুকতে দেখলে ঝাঁঝরা করে দেবে।

গাড়ি চুরি করবার প্ল্যানটা রসাতলে গেল।

সিঁড়িঘরের দরজা মৃদু শব্দে খুলল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। ভারী পর্দার আড়ালে চলে এসেছে রানা, হাতে স্মাইসার প্রস্তুত। দুটো ছায়ামূর্তি ঢুকল ভিতরে।

'সিঁড়ির আলো জ্বালো।'

আলো জ্বলে উঠতেই নিঃশব্দ পায়ে ছুটল ওরা উপর দিকে।

আর বোধহয় এক মিনিটও নেই, ধরা পড়ে যাবে রানা। সিঁড়ির আলোয় দেখতে পেল স্কি ইকুইপমেন্টে ভর্তি ক্লজিটটা খোলা। পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সেটার ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। বুট পরবার সময় কোমরে গোঁজা স্মাইসার পাঁজরে খোঁচা মারছে। স্টেপ-ইন বাইন্ডিং স্কি বুটের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করছে না বলে দেরি হচ্ছে।

স্কি আর স্কি পোল বগলের তলায় আটকে নিয়ে পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, মাথাটা নিচু করে রেখেছে। ড্রাইভওয়ে থেকে সরিয়ে স্তূপ করা হয়েছে তুষার, তার আড়ালে থেমে স্কি বাইন্ডিং-এর ঝামেলাটা সেরে নিচ্ছে ও। তুষারের আড়াল থাকায় উঠানের দু'জন ওকে দেখতে পাচ্ছে না। তারপর বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ল, উপরতলার জানালা থেকে কেউ নীচে তাকাতে পারে। রানা মুখ তুলতে যাবে, তিনতলা থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

বাঁধনটা শক্ত হয়নি, তবু চোখের পলকে তুষারে পোল গেঁথে রওনা হয়ে গেল রানা। দূরত্ব বাড়াবার জন্য 'ডাবল পোল স্ট্রাইড' টেকনিক ব্যবহার করছে। প্রথম খাদ পঞ্চাশ গজ দূরে। ওখানে পৌঁছে ঝাঁপ দিল। আর ঠিক তখনই প্রথম প্রভাতের নিস্তব্ধতাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গর্জে উঠল একটা স্টেনগান। সূর্য উঠছে, তারপরও পাহাড়ের নীচে গ্রামটার কিছু বাড়ি-ঘরে নিষ্প্রভ আলো জ্বলতে দেখা গেল। মাত্র তিন মাইল দূরে, অথচ মনে হলো একশো মাইল। পরিষ্কার আবহাওয়া, ঠাণ্ডাও কম। জোরাল বাতাস: স্কিয়ারদের জন্য দুঃসংবাদ।

তীরবেগে নামছে রানা। থামবার কোন ইচ্ছে ছিল না, তবে বাধ্য হলো। বাইন্ডিং খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ডান পা। আলগা স্কি ওকে ফেলে সামনে চলে গেল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সেটার পিছু নিতে হলো ওকে। ভাগ্য ভাল বলেই ধরতে পারল আবার।

স্কি বাইন্ডিং শক্ত করছে রানা। কাজটা নিখুঁত করতে হলে সময় দিতে হবে। শেষ করবার পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। ঢালে ও-ই একমাত্র স্কিয়ার নয়। ডোমেনিক আর আর্থার ওকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে।

ওদের কৌশল সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল। দু'জনেই এমন একটা কোর্স ধরেছে, সারাক্ষণ রানার চেয়ে উপরে থাকবে। সামনের লোকটা সঙ্গীকে চিৎকার করে কী যেন বলল। মুখটা অন্য দিকে ফিরানো বলে কথাটা রানা পরিষ্কার শুনতে

পেল না। তবে জবাবটা পরিষ্কার: 'হ্যাঁ, আর্থার, বুঝেছি।'

বুঝল রানাও। লোক দু'জন ওকে ঢালের সবচেয়ে খাড়া অংশে যেতে বাধ্য করবে। ওদিকে তুষারের স্তূপ, স্তূপের নীচে খাড়া পাথর, বাঁকা আর মোচড়ানো পথ পড়বে। রানাকে এক-আধবার থামানোটাই ওদের উদ্দেশ্য, কাঁধে ঝোলানো অস্ত্র নামিয়ে লক্ষ্যস্থির করবার জন্য।

ঢেউ খেলানো আর গোত্তা খাওয়া ঢাল ধরে স্কি ছুটিয়ে দূরত্ব কমিয়ে আনা সহজ কাজ নয়। কিন্তু আর্থার প্রায় অনায়াসেই পারল। রানা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে পারছে না। তীর বেগে ছুটছে, শুধু ভারসাম্য রক্ষা করে সিধে হয়ে থাকতেই কাজে লাগাতে হচ্ছে সবটুকু দক্ষতা।

নিজের আর রানার মাঝখানের ফাঁকটা কমিয়ে আনল আর্থার। পরবর্তী একশো গজ সমান্তরাল দুটো রেখা ধরে ছুটল দু'জন, আর্থার মধ্যবর্তী দূরত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে। সে চাইছে রানা একবার থামুক বা পড়ে যাক, তা হলে ওর ঠিক পিছন থেকে লক্ষ্যস্থির করে ব্রাশ করতে পারবে ডোমেনিক। পাশের ঢালে, কিছুটা নীচে রয়েছে ডোমেনিক–মারণাস্ত্রটা তার কাছেই।

আর্থারের মুখ বেশিরভাগই গগলসের আড়ালে, তবে দু'জন এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে তার নীরব হাসিতে উল্লাস দেখতে পেল রানা। নিজের উপর তার আস্থা আছে। থাকবারই কথা।

একটা ঝুঁকি নিল রানা। পালানোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিসর্জন দিয়ে বাঁক নিল, আর্থারের দিকে উঠছে, সামনে দিয়ে তাকে পাশ কাটাবে। বিস্মিত আর্থার অনেক দেরি করে শরীরটা মোচড়াল। রানার বাড়িয়ে দেয়া স্কি পোল ঠেকাবার জন্য নিজের স্কি পোল উঁচু করছে সে। রানার পোলের কঠিন ইস্পাতের ডগা কাপড় ভেদ করে পেটে সেঁধোল ঠিক পাঁজরের নীচে।

পোলটা হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল রানা। মুখ থুবড়ে ওর পায়ের কাছে পড়ল আর্থার। মারা যাবে, তারপরও হিংস্র। ওর পা ধরে টান দিল সে। পড়ে গেল রানা। তবে পড়েই প্রচণ্ড একটা লাথি মারল আর্থারের চিবুকে। স্কি আর বুট নিয়ে গড়াতে শুরু করল আর্থার। দশ গজ নীচে ডান দিকে কাত হয়ে গেছে ঢাল। তারপর তুষার ঢাকা গিরিখাদ, খাদের পর আরেক পাহাড়ের আরেক ঢাল। দুই পাহাড়ী ঢালের মধ্যবর্তী ফাঁক পাঁচ হাতও নয়, তবে দুটোর উচ্চতায় হেরফের আছে। গড়াতে গড়াতে গতি পেল আর্থার। এক ঢাল থেকে খসে পড়ল সে আরেক ঢালে। ওই ঢালেই, বিশ গজ নীচে রয়েছে তার সঙ্গী ডোমেনিক।

ডোমেনিক কোন ভুল করেনি; তবে দেখল আর্থারের কারণে তারও সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। ওদের অনেক নীচে, পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা রাস্তায় গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে কার্ট আর বাড। এখনও কিছু টের পায়নি, তবে ডোমেনিকের মত তারাও এখুনি উপলব্ধি করতে চলেছে–পালাবার কোন পথ নেই।

সামান্য একটু ধোঁয়ার মত দেখাল গুঁড়ো তুষার উড়তে শুরু করায়। আর্থার নামছে, তার সঙ্গে নামছে ওই সাদা মেঘ। মেঘটা প্রতি পলকে বড় হচ্ছে। যত

বড় হচ্ছে ততই বেশি আওয়াজ করছে। সেই আওয়াজ গর্জন হয়ে উঠল। গর্জনের উৎস তুষার-ধস আকারে আর ওজনে হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছে। এক সময় মনে হলো গোটা পাহাড়টাই পড়ে যাবে; সমতল না হবার আগে থামবে না। কে বলবে আর্থার আর ডোমেনিক কোথায়! কয়েক হাজার টন তুষারের নীচে চাপা পড়ে গেল নীচের রাস্তা। পরিষ্কার করে গাড়ি চলাচলের উপযোগী করতে অন্তত এক হপ্তা লেগে যাবে। ততদিনে বেন্টলির ভিতর অপেক্ষা করুক কার্ট আর বাড। লাশ হয়ে।

দশ

হোটেলের পিছনদিকের একটা কোণ ঘুরে নিজের কটেজের দিকে এগোচ্ছে রানা। হোটেলের মেইডসার্ভেন্ট, মোটাসোটা এক মহিলা, বারান্দা আর সিঁড়ির ধাপ থেকে তুষার পরিষ্কার করছে। রানাকে দেখে চিনতে পারল সে, হাতের ঝাঁটা বগলে চেপে এগিয়ে এসে দরজার তালাটা খুলে দিল।

ঝুঁকে স্কি খুলছে রানা। 'কিছুক্ষণ পরই চল্লে যাব আমি,' পিছন থেকে বলল ও, কারণ মহিলা উঁকি দিয়ে কটেজের ভিতরটা দেখছে। রাতে যে বিছানাটা ব্যবহার করা হয়নি, এটা সে নিশ্চয়ই খেয়াল করল।

ভিতরে ঢুকে দ্রুত হাতে নিজের আর লেনার ব্যাগ দুটো ভরে নিল রানা। এখনই ওকে এই শহর ছেড়ে পালাতে হবে। পড়ে থাকল শুধু থান্ডারের জ্যাকেটটা। ফোন করে একজন বেলবয়কে ডেকে নিল ও।

ব্যাগেজ আর স্কি ইকুইপমেন্ট কার্ট-এ তুলে নিয়ে গ্যারেজের দিকে চলে গেল বেলবয়, ল্যানসিয়ার বুটে ভরবে। তাকে পাশ কাটিয়ে হোটেলের মূল দালানে চলে এল রানা।

ক্যাশিয়ার মেয়েটা জানাল, শহরের পুবদিকের রাস্তা তুষার-ধসের কারণে আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ জানিয়ে রসিদ আর নিজেদের পাসপোর্ট নিয়ে পকেটে ভরল রানা।

গ্যারেজের খোলা দরজায় রানার জন্য অপেক্ষা করছিল বেলবয়। তাকে বকশিশ দিয়ে বিদায় করল ও। গ্যারেজে ঢুকতে যাবে, এই সময় ল্যানসিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল সুরভিকে। প্রায় আঁতকে উঠে রানা জানতে চাইল, 'তুমি এখানে কী করছ?'

ম্লান হলেও, একটু হাসল সুরভি। 'ঢাকায় ফোন করে বসকে একটা তথ্য দিই আমি, শুনে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বললেন, তথ্যটা আপনার কাজে লাগবে।'

রানা চিন্তা করছে। ওর পকেটে রয়েছে সেফ ডিপোজিট কী। কাজের মধ্যে

বাকি আছে শুধু ডক্টর দানিশের মেয়ে তামান্নাকে খুঁজে বের করা। একমাত্র তামান্না মুবারকই সেফ ডিপোজিট বক্সটা খুলে দেখতে পারবে ভিতরে কী আছে। যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে সুরভিকে শোনাল ও, সবশেষে বলল, 'আমার আর শুধু একটা তথ্য দরকার। তামান্না মুবারক কোথায় আছে।'

'রু দ্য লাউসানে, সেন্ট পিটার্স হসপিটালে।'

'মানে?'

'এই তথ্যটাই তো বসকে দিই আমি।'

'কিন্তু তুমি জানলে কীভাবে?'

'বাই পোস্টে,' বলল সুরভি। 'ফ্রেঞ্চ পোস্টাল সার্ভিসে লেট ডেলিভারি সিস্টেম বলে একটা ব্যাপার আছে,' ব্যাখ্যা করল সুরভি। 'প্রেরক যখনই তার চিঠি পোস্ট করুক, তার উল্লেখ করা তারিখের আগে প্রাপককে সেটা ডেলিভারি দেয়া যাবে না। এজন্যে তাকে একটা ফরম পূরণ করতে হয়, সেই ফরমে লেখা থাকে প্রাপককে কবে চিঠিটা ডেলিভারি দিতে হবে।'

'বেশ।'

'কাল আমি সেরকম একটা চিঠি পেয়েছি,' বলল সুরভি। 'আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানায়। চিঠিটা বড়দা, পোস্ট করেছিলেন, আট-দশ দিন আগে। নাম আর ঠিকানা ছাড়াও তাতে লেখা আছে, হসপিটালের যে কেবিনে তামান্না আছে তার ভাড়া এবং চিকিৎসার সমস্ত খরচ বড়দার অ্যাকাউন্ট থেকে মেটানোর ব্যবস্থা করা আছে।'

'রেদোয়ান চলে গেছেন ঠিকই, তবে যাবার আগে সব কিছু গুছিয়ে রেখে গেছেন,' বলল রানা, ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধায় আরেকবার আপ্লুত হলো মনটা। তবে পরমুহূর্তেই অস্থির হয়ে উঠল ও। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। চলো, কেটে পড়ি।'

পরিষ্কার করা সত্ত্বেও হাইওয়ের কোথাও কোথাও নতুন করে তুষার জমেছে, বেশি স্পীড তোলাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। রিয়ার-ভিউ মিররে একটা চোখ রাখছে রানা। একটা গাড়ি ওদের পিছু নিয়ে আসছে, ছাদে পরিচিত ফোলা ভাব। রাস্তার বাঁকে বা মোচড়ে হারিয়ে যাচ্ছে ওটা, তবে সরল বিস্তৃতি পেলে দূরত্ব কমিয়ে আনছে। স্পীড একবার পঞ্চাশে তুলেও পঁয়ত্রিশে নামিয়ে আনল রানা। একটা পুলিশ কারকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ল্যানসিয়ার জন্য কোন সমস্যা নয়, কিন্তু ওকে থামাবার জন্য সামনে যদি রোডব্লক থাকে? পিছনের গাড়ির ছাদে নীল আলো ফ্ল্যাশ করছে দেখে হাইওয়ের পাশে ল্যানসিয়া দাঁড় করাল রানা।

ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার অত্যন্ত ভদ্র। ল্যানসিয়ার প্লেট নাম্বার টুকে নিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলল। তবে না, ড্রাইভিং পারমিট দেখতে চাইল না। 'প্লিজ, মঁশিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ক্লস্টার্সে ফিরে যেতে হবে।'

'আপনি কি আমাকে অ্যারেস্ট করছেন?'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয় মঁশিয়ে। তুষার ধসটা নিয়ে কিছু সন্দেহ দেখা

দিয়েছে। তাই কয়েকটা প্রশ্ন করা হবে। আমরা আন্দাজ করছি যেহেতু আপনি আজ খুব সকালে স্কিইং করছিলেন, তদন্তে হয়তো সাহায্য করতে পারবেন। জানেন বোধহয় যে একটা লাশ পাওয়া গেছে। তিনিও একজন স্কিয়ার। সেজন্যেই আপনাকে আমরা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাব।'

পিছনে পুলিশ কার নিয়ে ক্লস্টার্সে ফেরবার সময় গাড়ি আস্তেই চালাচ্ছে রানা। সময়টা ব্যয় করল পরিস্থিতি সম্পর্কে সুরভিকে একটা ধারণা দিতে আর স্মাইসার পিস্তলটা ড্যাশবোর্ডের তলায় লুকাতে। সেফ ডিপোজিট বক্সের চাবিটা সুরভির হাতে গুঁজে দিল ও। 'এটা নিয়ে জেনেভায় চলে যাবে তুমি। শেরাটনের একটা স্যুইট ভাড়া করবে। আমি যদি কাল সকাল ছ'টার মধ্যে না পৌঁছাই, বসকে টেলিফোন করে জানাবে যে সাহায্য দরকার তোমার। তারপর গোটা ব্যাপারটা তিনি সামলাবেন।'

শতবর্ষের পুরানো মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিঙের বেযমেন্টে ক্লস্টার্স পুলিশ স্টেশন। টাক মাথা সার্জেন্ট প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছে, তার মধ্যে খুব কমই সত্য। তুষার-ধসের চরম সর্বনেশে পর্যায়টা গ্রামের প্রায় সব লোকই নাকি দেখেছে। প্রাণ হাতে করে স্কিয়াররা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটছে, মুহূর্তের জন্য এরকম দৃশ্যও চাক্ষুষ করেছে বলে দাবি করেছে কেউ কেউ। বার্ন হাউস-এর এক মহিলা কর্মচারী উপযাচক হয়ে পুলিশকে জানিয়েছে, তুষার-ধসের খানিক পরই স্কি করে কটেজে ফিরে আসে রানা।

হঠাৎ থেমে সুরভির দিকে তাকাল সার্জেন্ট। 'আপনি কে? ওঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

'আমি ট্যুরিস্ট,' নিরীহ একটা ভাব করে বলল সুরভি। 'এই ভদ্রলোকের কাছে লিফট চাই–'

সার্জেন্ট ওকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'অচেনা মানুষের কাছে ভুলেও কখনও লিফট চাইবেন না–' কথাটা শেষ করতে পারল না, একজন কনেস্টবল এসে অফিস থেকে ডেকে নিয়ে গেল তাকে।

দরজার বাইরে এক লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেল সার্জেন্টকে। লোকটার মাথায় সোনালি চুল, উইন্ডব্রেকারে 'স্কি পেট্রল' লেখা একটা ব্যাজ রয়েছে। রানা তাকিয়ে আছে দেখে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সার্জেন্ট।

মিনিট দশেক নিঃশব্দে পার হয়ে গেল। এরপর একজন অফিসার এসে সুরভিকে বলল, আপনি চলে যেতে পারেন। সুরভি রানার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে বা পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মনে মনে তার প্রশংসা করল রানা। ওকে অন্য একটা কামরায় নিয়ে এল অফিসার, আধবুড়ো একজন কেরানি ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে।

একটা চেয়ারে বসে এক ঘণ্টার উপর পার করে দিল রানা। অফিসার কাজ থেকে মুখ তুলে বার দুয়েক ওর দিকে তাকাল, ওকে বসিয়ে রাখা হচ্ছে বলে দুঃখও প্রকাশ করল। তৃতীয়বার ক্ষমা প্রার্থনার সময় সার্জেন্টের ফিরতে দেরি

হবার কারণটা ব্যাখ্যা করল: আরও একটা গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। স্কি পেট্রল-এর একজন সদস্য ড্রাগনার শ্যালেই থেকে মর্মান্তিক একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। তাই সার্জেন্ট ইনভেস্টিগেটিং টিম গঠন করতে ব্যস্ত। মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা কী, অফিসার সেটা ব্যাখ্যা করল না। তার কোন দরকারও নেই। হঠাৎ করে তাজা বাতাসের খুব অভাব বোধ করল রানা।

লাঞ্চের সময় কামরার ভিতর একা হয়ে গেল ও। অনেকক্ষণ হলো ঘরে কেউ ঢুকছে না দেখে চেয়ার ছেড়ে দরজাটা খুলল। করিডরে বেরিয়ে দেখে সিঁড়ির গোড়ায় একদল লোক জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। সবাই যে তারা ইউনিফর্ম পরা, তা নয়, বিজনেস সুট পরা লোকজনও রয়েছে। তাদের মধ্যে সার্জেন্টকেও দেখা গেল। রানাকে দেখে হন-হন করে এগিয়ে এল সে। 'মিস্টার রানা, সত্যি দুঃখিত। আপনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। খুব বড় একটা ক্রাইম–,' নিজেকে সামলে নিয়ে ভিড়টার দিকে হাত তুলল। 'দেখতেই পাচ্ছেন কেমন ব্যস্ততার মধ্যে আছি। শুনুন, তুষার ধসটাকে এখন আমরা অল্পই গুরুত্ব দিচ্ছি। আপনার গাড়ি–'

'আমি জানি কোথায় আছে ওটা,' বাধা দিয়ে বলল রানা, পালাবার জন্য অস্থির।

'না, থামুন!' বলল সার্জেন্ট। 'আরেকটা ভুলের জন্যে ক্ষমা চাই। আসলে আমাদের লোকবল খুব কম তো, তাই প্রায়ই এরকম ঘটছে। আপনাকে রিলিজ করবার কাগজ-পত্র সব রেডি। কিন্তু যে রেডি করেছে, মানে, যার কাছে কাগজগুলো আছে, তাকে আমি ড্রাগনার দুর্গে পাঠিয়েছি। সত্যি দুঃখিত, সত্যি। আমি নিজে সেখানে যাচ্ছি এখন, গিয়েই আপনার রিলিজ অর্ডারটা পাঠিয়ে দেব।'

'সে আপনার দয়া। অপেক্ষা করতে হওয়ায় আমি কিছু মনে করছি না,' মিথ্যে কথা বলে ভালমানুষ সাজছে রানা। 'আমি লাঞ্চ খেয়ে ফিরে আসছি।' লাঞ্চের ব্যাপারটা সত্যি। পেটটা ওর খিদেতে মোচড়াচ্ছে।

পাঁচ-সাতজন লোককে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা, তারপর বেরিয়ে এল রোদ ঝলমলে বিকেলে। লোকগুলো ফুটপাথ ঘেঁষা দুটো গাড়িতে চড়ে দুর্গের দিকে চলে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা, চিন্তা করছে উভয়সঙ্কট কীভাবে সামাল দেওয়া যায়। হঠাৎ রাস্তা পার হয়ে সুরভিকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল ও। 'এখানে কী করছ তুমি?' কাছে আসতে তাকে জিজ্ঞেস করল। 'তোমাকে না আমি চলে যেতে বলেছি?'

'যাচ্ছিই তো! সুইসএয়ার ফ্লাইট ধরতে হলে বাসে উঠতে হবে এক ঘণ্টা পর, জেনেভায় পৌঁছাব আজ রাত ন'টায়। ট্রেন ধরতে চাইলে স্টেশনে পৌঁছাতে হবে সাড়ে ছ'টায়। কোথাও অপেক্ষা করতে হবে, কাজেই রাস্তার ওপারের একটা রেস্তোরাঁয় বসে ছিলাম, আশা করছিলাম আমি রওনা হবার আগে আপনাকে রিলিজড্ হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখব।'

'লোকজন আমাদেরকে এক সঙ্গে দেখলে সমস্যা হতে পারে,' বলল রানা, সুরভির হাত ধরে ফুটপাথের কিনারা ধরে হাঁটছে। 'মনে নেই–তুমি লিফট চেয়েছ, এটুকুই আমাদের পরিচয়।'

একটা সাইড রোডে চলে এল ওরা। সাইনবোর্ড দেখে ছোট যে রেস্তোরাঁয় ঢুকল সেটা একটা পরিবারের সদস্যরা চালায়। রানা বসল দরজা আর জানালার দিকে মুখ করে।

'ওই মেয়েটা সম্পর্কে বলুন, মাসুদ ভাই,' ওদের খাওয়া শেষ হয়ে আসতে হঠাৎ জানতে চাইল সুরভি। 'যে আপনাকে সেফ ডিপোজিটের চাবিটা দিল।'

'মারা গেছে।'

'ওহ্, রিয়েলি সরি! কীভাবে মারা গেল?'

একটা ঘটনা ঘটতে শুরু করায় রানা আর উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেল না। জানালার বাইরে থেকে উৎফুল্ল হাসি নিয়ে পরিচিত এক লোক ওর উদ্দেশে হাত নাড়ছে। রানা তাকে না চেনবার ভান করলেও, সে নাছোড়বান্দা। হাসিতে কাজ হচ্ছে না দেখে মুখটা গম্ভীর করে ফেলল সে, কিন্তু ফুটপাথ ছেড়ে নড়ছে না কিছুতেই।

এ হলো ভলমার, বার্ন হাউসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, রানা আর লেনাকে সবচেয়ে আরামদায়ক কটেজে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

'পিছন দিকে তাকিয়ো না,' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়বার সময় সুরভিকে সাবধান করে দিল রানা।

ওকে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ভলমারের মুখ আবার হাসিতে ভরাট হয়ে গেল। 'আহ্, এই তো, হের রানা। আপনার আর আপনার লাভলি গার্লফ্রেন্ডের কথা ভেবে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।' জানালা দিয়ে সুরভির দিকে আবার তাকাল সে।

'দুশ্চিন্তায় ছিলেন?'

'মানে, যখন শুনলাম যে রাতটা আপনারা কটেজে কাটাননি, তারপর জানতে পারলাম দুর্গে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে–,' রানার চেহারায় বিস্ময় দেখে থেমে গেল সে। 'সেকি! আপনি জানেন না? ড্রাগনার শ্যালেইতে কয়েকজন খুন হয়েছে। লাশও তো শুনলাম নিয়ে এসেছে। খুন হয়েছে দু'জন লোক, আর একটা তরুণী মেয়ে। খবরটা শুনে, বুঝতেই পারছেন, মনে পড়ল কটেজটা রাতে খালি ছিল।

'তবে এর মধ্যে আরও ব্যাপার আছে। ওখানে এক বৃদ্ধকে পাওয়া গেছে, যখন তখন অবস্থা। আরেক লোক, সম্ভবত ড্রাগ ওভারডোজ হয়ে যাওয়ায়, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ওদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের গ্রামে এরকম ভয়ঙ্কর ক্রাইম আগে আর কখনও ঘটেনি...'

দুঃসংবাদটা আরও লোকের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে ভলমার, রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেই ছুটল সে।

টেবিলে ফিরে এসে সুরভিকে রানা বলল, 'বাঁধ ভেঙে গেছে, পানির তোড়ে

আমি না ভেসে যাই।' কী ঘটেছে, বৃত্তটা কীভাবে ছোট হয়ে আসছে, সংক্ষেপে সবই ব্যাখ্যা করল ও। এটা সন্দেহ করতে পুলিশের খুব বেশি সময় লাগবে না যে ক্ষতবিক্ষত মেয়েটার লাশ রানার বান্ধবীর হতে পারে, যে বান্ধবী কাল রাতে হোটেল কটেজে রাত কাটায়নি। আজ সকালে তাড়াহুড়ো করে হোটেল ত্যাগ করেছে ও, এটাকেও সন্দেহের চোখে দেখা হবে। বার্ন হাউস হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ভলমার শশব্যস্ত হয়ে চলে গেল–তার এই যাওয়ার বিশেষ তাৎপর্য থাকতেও পারে। রানার বান্ধবী লেনাকে সে দেখেছে, জানে তার চুল সোনালি। খানিক আগে পিছন থেকে সুরভি আর তার কালো চুল দেখে কেন তাকে সে লেনা বলে ধরে নেবে?

ব্যস্ত হয়ে কোথায় গেল ভলমার? পুলিশ স্টেশন এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

ইতোমধ্যে বিল মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে ওরা। গা ঢাকা দেওয়ার জন্য আপাতত একটা সিনেমা হলের ভিতর ঢুকে পড়ল।

'ল্যানসিয়া ব্যবহার করা উচিত হবে না,' অন্ধকার হলে বসে ফিসফিস করে বলল রানা। 'কার, বাস, ট্রেন–আমার খোঁজে কিছুই সার্চ করতে বাকি রাখবে না ওরা। প্রথম কাজ, দু'জন বিচ্ছিন্ন হওয়া।'

'আমি নিরাপদেই জেনেভায় পৌঁছাতে পারব। আপনি?'

'দেখি কী করা যায়।'

'বড় একটা ডিপ্লোম্যাটিক বাক্সে ভরে ট্রেনে তুলে দিতে পারলে···

'কী বললে?'

সুরভির ঠোঁটে অপ্রস্তুত হাসি। 'না, মানে, কিছু না–উইশফুল থিংকিং।'

এটা একটা আইডিয়া। রাতের ট্রেনে বক্স-টক্স তো থাকেই। ওকে শুধু কারও চোখে ধরা না পড়ে একটায় উঠে পড়তে হবে। সুরভির সাহায্যে কাজটা করেও ফেলতে পারে ও। মুহূর্তে তৈরি হয়ে গেল পরিকল্পনা।

ফিসফিস করে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল রানা। সুরভি শুনছে আর মাথা ঝাঁকাচ্ছে। রানা থামতে সে-ও ফিসফিস করল: 'কিন্তু খুব সাবধানে, মাসুদ ভাই!'

এগারো

ক্লস্টার্স-এর বাহনহফ থেকে ডাভোস। সুইস ফেডারেল রেলওয়ের লাইন পাইন বনভূমির ভিতর দিয়ে ধীর ভঙ্গিতে উঠে ল্যান্ডকোয়ার্ট নদীর উপর একটা ব্রিজ পেরিয়েছে। ট্রেন শুধু তারপরই গতি পায়, আরেক রিসর্ট শহর উলফগ্যাঙ-এর দিকে নামতে শুরু করবার পর।

ক্লস্টার্স থেকে ল্যান্ডকোয়ার্ট ব্রিজ সাত মাইল, কিন্তু রানার কাছে লাগছে বিশ

মাইল। পুরো পথটাই চড়াই। একে তো পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠাণ্ডা আর অন্ধকার, তার উপর রেল রোড স্লিপার আর নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে হাঁটো। অবশ্য ট্রেন আসবার আধ ঘণ্টা আগেই ব্রিজে পৌঁছে গেল রানা। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। সময় পাওয়া গেল চিন্তা-ভাবনা করবার।

প্রথম কথা আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি।

সিনেমা হলে বসেই সুরভি ওকে জানিয়েছে, পুলিশের অনুমতি পেয়ে ল্যানসিয়া থেকে নিজের ওভারনাইট ব্যাগটা বের করবার সময় ড্যাশবোর্ডের তলায় লুকিয়ে রাখা স্মাইসার পিস্তলটা শোল্ডার ব্যাগে ভরে নিয়েছে সে। সেই পিস্তলটা আর অতিরিক্ত সব টাকা সুরভির কাছ থেকে চেয়ে নেয় ও।

সিনেমা হল থেকে ওরা বেরিয়ে আসে আলাদাভাবে। রানা একটা মার্কেটে ঢুকে শপিং শুরু করে। ছোট একটা রাকস্যাক কিনেছে, কিনেছে স্কি গ্লাভস আর ফেস মাস্ক। রাকস্যাকটায় কিছু হার্ডওয়্যার আছে–বিশ ফুটী নাইলন ক্লাইম্বার রোপ আর লোডেড স্মাইসার ছাড়াও একজোড়া টুল: খুদে হাতুড়ি, টেমপারড্ স্টীল পাঞ্চ।

শপিং করবার পর কঠিন কাজটা ছিল সর্বশেষ তথ্য সুরভির কাছ থেকে না পাওয়া পর্যন্ত কারও চোখে ধরা না পড়া। বাহনহফ রেলস্টেশনের ওয়েটিংরুমে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ফোন করেছে রানা।

প্রথম রিঙেই সাড়া দিয়েছে সুরভি।

'রিপোর্ট করো,' নির্দেশ দিল রানা।

'আপনি যেমন ধারণা করেছিলেন, সিকিউরিটি খুব কড়া এদিকে। তিন ভদ্রলোক গোটা ব্যাপারটা সামলাচ্ছেন। একজন রেলরোড ট্রেনমাস্টার, ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ অফিসার আর বিজনেস সুট পরা এক ভদ্রলোক–দেখে মনে হচ্ছে, এই সুটই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সাদা পোশাকে ইনিও হয়তো পুলিশই।'

'সিকিউরিটি খুব কড়া বলছিলে।'

'আজ এমনকী শুধু ওয়েটিংরুমে ঢুকতে হলেও টিকিট দেখাতে হচ্ছে। প্রত্যেককে বাধ্য করা হচ্ছে কাগজ-পত্র দেখাতে। একবার ঢোকার পর কাউকে আর বেরুতে দিচ্ছে না। ভাবটা যেন, গার্ডরা এসকর্ট করে ট্রেনে তুলে দেবে সবাইকে। আমি কমপার্টমেন্ট বি-সিক্সে থাকব। খুব আরামদায়ক বক্স। ডাভোস পর্যন্ত ওটাই ট্রেনের শেষ কার। ডাভোস থেকে আরও কার জোড়া হবে। ট্রেন ছাড়বে আটটা বাজতে দশ মিনিট থাকতে।'

ল্যান্ডকোয়ার্ট ব্রিজে পৌঁছাবার জন্য হাতে প্রচুর সময় ছিল রানার, কিন্তু তাড়াতাড়ি ক্লস্টার্স ত্যাগ করবার তাগাদায় একটু বেশি আগে রওনা দেয় ও। জানত চড়াই বেয়ে ব্রিজ পর্যন্ত উঠতে শরীরটা গরম আগুন হয়ে যাবে, সেজন্যই এক সেট থারমাল আন্ডারওয়্যার কেনেনি। এই মুহূর্তে ব্রিজের এক প্রান্তে গুটিসুটি হয়ে বসে সদ্য শুরু হওয়া তুষারপাতে ভিজছে আর ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে নিজেকে গাল দিচ্ছে রানা।

সুইস রেলের সময়ানুবর্তিতার ঐতিহ্য বজায় রেখে শেডিউল ধরে যথাসময়েই আসতে দেখা গেল ট্রেনটাকে। বরফের মত ঠাণ্ডা ইস্পাতের কাঠামো বেয়ে ব্রিজের উপর দিকে উঠছে রানা। একটা হরিজনট্‌ল্ আই-বীমকে জড়িয়ে ধরল। ট্রেন আসছে মন্থর গতিতে। ঠাণ্ডা বাতাস বিভ্রান্ত করতে চাইছে ওকে, চোখে তুষার কণার হামলা হচ্ছে। হাতের হিম আঙুলে ক্র্যাম্প ধরে যাচ্ছে।

ট্রেন অসম্ভব দেরি করে পৌঁছাল। আই-বীম ছেড়ে দিয়েছে রানা, কিন্তু শরীরটা তারপরও পড়ছে না। আতঙ্ক গ্রাস করতে চাইল ওকে। বীম থেকে হাত ছাড়ানোর নির্দেশ মস্তিষ্কে ঠিকই পৌঁছেছে, কিন্তু মস্তিষ্ক থেকে পাঠানো সেই নির্দেশ ক্র্যাম্প ধরা অসাড় আঙুলে ঠিক মত পৌঁছাচ্ছে না। আঙুল ঢিলে হলো কয়েক সেকেন্ড পর। দেরিতে শুরু হওয়া পতন বিপজ্জনক হয়ে উঠল। বেকায়দা ভঙ্গিতে ছাদের একেবারে কিনারায় পড়ল রানা, একটা পা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থাকল ট্রেনের বাইরে। ছাদে এমন কিছু নেই যেটা ধরে পতন ঠেকানো যাবে। শুধু বাতাস আর মাধ্যাকর্ষণের চাপ ওর পঁচাশি কেজি শরীরটাকে পিছলে নীচে পড়তে দিচ্ছে না। নিঃশব্দে সুইস রেলরোড ইঞ্জিনিয়ারদের ধন্যবাদ দিল রানা, মসৃণ একটা রোডবেড বানাবার জন্য। ওর নীচে বগিটা অতি সামান্যই দুলছে। তবে পাহাড়চূড়া পিছনে ফেলে আসবার পর স্পীড বাড়তে শুরু করেছে ট্রেনের।

ক্রল করে ছাদের বাঁ দিকে চলে এল রানা। স্লিপিং কার-এর জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা এক সারি চৌকো হলুদ আলো ট্রেনের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে দেখা যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে একটা আলো বারবার জ্বলবে আর নিভবে। ওটাই সুরভির সংকেত। সে কোন্ কমপার্টমেন্টে আছে তা তো জানা যাবেই, এ-ও জানা যাবে যে এখন ওই কমপার্টমেন্টে ওর যাওয়া নিরাপদ কিনা।

ট্রেন আরও দ্রুত নীচে নামতে শুরু করল। ছাদের কিনারায় স্থির থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। তুষার কণা আর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডাও ঠাণ্ডায় হি-হি করছে ও। মিনিটের পর মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে। সুরভির হলোটা কী? ব্রিজ পেরোবার সময় যান্ত্রিক গর্জন হয়েছে, শুনতে না পাবার কোন কারণ নেই। তার তো ওই ব্রিজের জন্য অপেক্ষা করবার কথা।

নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে।

এই সময় হঠাৎ একটা আলো নিভেই আবার জ্বলে উঠল। না, কই! নিশ্চয়ই চোখের ভুল। তারপর আবার নিভল, আবার জ্বলল। না, ভুল নয়। এখন রানা জানে বি-সিক্স কমপার্টমেন্টটা কোথায়। সরাসরি ওটার উপর পৌঁছাবার জন্য পনেরো ফুট ক্রল করতে হলো।

হাতুড়ির বাড়ি মেরে স্টীল-পাঞ্চের তীক্ষ্ণ ডগা ট্রেনের ছাদে ঢুকিয়ে দিল রানা। প্রয়োজন মত একটা গর্ত তৈরি করবার পর হেভি ডিউটি হুক আটকাল তাতে। হুকটার সঙ্গে আগেই জোড়া দিয়েছে একটা পুলি। পুলির ভিতর দিয়ে নাইলন রোপের একদিকের প্রান্ত বের করে নিয়েছে। টানাটানি করে দেখল রশির দুই প্রান্তই পুলির ভিতর দিয়ে সাবলীলভাবে আসা-যাওয়া করছে, হুকটাও জায়গা

ছেড়ে বেরিয়ে আসছে না।

সুরভি দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে, দরজার সামনে, আলোর সুইচে আঙুল রেখে। হঠাৎ জানালার বাইরে রানাকে উল্টো অবস্থায় দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে।

নিজেকে সিধে করে নিল রানা, রশির দুটো ধারা উরুর নীচে আর উল্টোদিকের কাঁধে জড়াল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। দু'সারি দাঁত বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। এগুলো হাইপথারমিয়ার লক্ষণ। লো ব্ল্যাড প্রেশারে মারা যেতে না চাইলে সুরভির জানালা দিয়ে কমপার্টমেন্টের ভিতর এখনই ঢুকতে হবে রানাকে।

অসহায়ভাবে ঝুলছে ও। ওদিকে জানালার সঙ্গে লড়ছে সুরভি। এটা ইউরোপের সাধারণ রেল কার। জানালায় লেদার বা ট্যাপিসট্রি স্ট্র্যাপ ব্যবহার করা হয়েছে, শার্শির নীচের অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। কোন জানালা খুলতে চাইলে, প্রথমে সিল বা গোবরাট বিচ্ছিন্ন করবার জন্য কাঁচের ফ্রেম উঁচু করতে হবে, তারপর জানালাটা খাঁজ কাটা গর্তে নেমে যাবে। বাষ্প লেগে আবছা হয়ে থাকা সামান্য একটা কাঁচ বাক্স আকৃতির উষ্ণ, আলোকিত আর নিরাপদ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে রানাকে। টানা-হ্যাঁচড়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে সুরভি, জানালাটা খুলতে পারছে না।

এক হাতে ঝুলে থেকে অপর হাত দিয়ে জানালাটায় বাইরে থেকে চাপ দিল রানা। দু'জনের চেষ্টায় সফল হলো ওরা। ঝট করে স্থানচ্যুত হয়ে গর্তের ভিতর পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জানালা। ভিতরে ঢুকে কমপার্টমেন্টের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা। রশিটা ধরে টানছে, পুলির ভিতর থেকে পুরোটা টেনে এনে সুরভির হাতে ধরিয়ে দিল। সুরভি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

বাপরে-বাপ! হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে আধ-খোলা জানালা দিয়ে। ওটা বন্ধ করবার চেষ্টা করছে সুরভি দাঁতে দাঁত চেপে, কিন্তু তুলতে পারছে না আর। হাত লাগাল রানাও, কিন্তু জ্যাম হয়ে যাওয়ায় উপর দিকের শেষ চার ইঞ্চি কিছুতেই আর উঠল না। না উঠুক, এই মুহূর্তে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না রানা, পরিস্থিতি বুঝে নেয়াটা দরকার আগে।

রানার প্রশ্নের উত্তরে জানাল সুরভি, 'উফ্, মাসুদ ভাই, কী যে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম! ট্রেন রওনা হবার খানিক পরেই শুরু হয় চেকিং। দুই-দুইজন পুলিশ অফিসার গোটা কমপার্টমেন্ট চিরুনি দিয়ে আঁচড়েছে। এইমাত্র বেরিয়ে গেল। কন্ডাকটারকে দিয়ে আপার বার্থ-এর তালা পর্যন্ত খুলিয়েছে—সেখানে যদি আপনি লুকিয়ে থাকেন। তারপর সীল করে দিয়ে গেছে ওটা।'

'ওরা আমার নাম বলল?'

'তা না বললেই কী, চেহারার যে নিখুঁত বর্ণনা দিল সেটা হুবহু আপনারই। একজন অন্ধও চিনতে পারবে।'

সুরভির বেড তৈরি। শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল মেয়েটা। জালি কাপড়ের তৈরি

কামিজের নীচে সাদা সিল্কের সালোয়ার পরেছে সে।

সুরভির বিছানা থেকে ছোঁ দিয়ে একটা কম্বল তুলে নিয়ে ছোট্ট টয়লেটে ঢুকল রানা। ওয়াশ-বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে গরম পানির ট্যাপটা ছেড়ে আঙুলগুলো ভেজাল বেশ কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে সাড়া ফিরে পেল ওগুলো। ভেজা ট্রাউজার বা শার্টের বোতাম খুলতে কোন সমস্যা হলো না। কাপড় ছেড়ে শুকাবার জন্য ঝুলিয়ে দিল ব্র্যাকেটে, তারপর শরীরে কম্বল জড়িয়ে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে দেখল এখনও জানালাটা পুরোপুরি বন্ধ করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সুরভি। 'দাও, আমি বন্ধ করি,' বলল রানা।

'আটকে গেছে,' অসহায় দেখাল সুরভিকে। ফাঁক গলে ঝড়ের বেগে হিম হাওয়া ঢুকছে ভিতরে।

কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে জানালাটা উঁচু করবার চেষ্টা করল ওরা। আংশিক খোলা অবস্থায় খুব শক্তভাবে জ্যাম হয়ে গেছে ওটা। পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা আর ঘষা লাগছে।

'কোন লাভ নেই,' হার মেনে নিয়ে বলল সুরভি। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। 'এখন কী-ক্বী হবে?'

'সোজা বার্থে উঠে কম্বল মুড়ি দাও,' বলল রানা। দুটো বালিশের একটা নিয়ে ফাঁকটায় গুঁজতে চেষ্টা করল। কিছুটা কাজ হলো তাতে, কিন্তু একদিকে আট ইঞ্চির মত কাভার করা গেল না। মুশকিল হলো, কম্পার্টমেন্টের হিটার যতটুকু উত্তাপ তৈরি করতে পারছে জানালার ফাঁকটা তারচেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে দিচ্ছে ভিতরে।

একটা চাদর আর একটা কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ল সুরভি। কাঁপুনি ধরে গেছে তার। শরীর গরম রাখবার জন্য পায়চারি শুরু করল রানা।

'আ-আপনি নিজেকে অযথা ক্লান্ত করছেন,' দাঁতের খটাখট আওয়াজের ফাঁক দিয়ে কোনমতে বলল সুরভি। 'বা-বার্থে উঠে আসুন। দুটো কম্বল এক ক-করলে দু'জনেই আরেকটু গ-গরম পেতে পারি।' বিছানায় উঠে বসল সে। 'এছাড়া উপায় নেই, মাসুদ ভাই।'

হাইপথারমিয়ার ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান, ভদ্রতাবোধ ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে সুরভির বার্থে উঠে পড়ল রানা। যদিও আয়োজনটা হলো অপর্যাপ্ত আর বিব্রতকর। বিব্রতকর এই জন্য যে একজন পুরুষ আর একজন নারী নিজেদের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে মাত্রা ছাড়ানো সচেতনতা ছাড়া বেশিক্ষণ গায়ে গা ঠেকিয়ে থাকতে পারবে না। হাঁটু ভাঁজ করে গায়ে-গায়ে লেগে চামচের মত শুয়ে আছে ওরা। সুরভির পিঠে রানার রোমশ বুক। তারপরও না রানা, না সুরভি, কারও কাঁপুনি থামছে না।

'এতে তেমন কাজ হচ্ছে না,' এক সময় বলতে বাধ্য হলো রানা।

'ন-ন-না,' সমর্থন করল সুরভি।

'তার চেয়ে আমি বরং...'

'ন-না!' আবারও বলল সুরভি। তারপর ঘুরে শুলো।

ব্যাকুল দু'জোড়া হাত জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে। অপ্রশস্ত বার্থের উপর জোড়া লেগে এক হয়ে গেল ওরা। শক্ত করে ধরে আছে একে অপরকে। ধীরে ধীরে কমছে শীতের প্রকোপ। উত্তাপ বিনিময় করে ধীরে গরম হয়ে উঠছে দুজনই। বেশি উত্তপ্ত হওয়ার আগেই কম্বলের নীচ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হাতের বাঁধন আলগা করল না সুরভি কিছুতেই।

মৃদু দোলা দিচ্ছে ট্রেন, ছুটে চলেছে সগর্জনে।

আকাশ ফর্সা হয়ে আসতে ঘুম ভাঙল রানার। ট্রেনের গতি কমে যাচ্ছে দেখে বোঝা গেল সামনে জেনেভা। সুরভি অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বার্থ থেকে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় পরবার জন্য টয়লেটে ঢুকল রানা। বেরিয়ে এসে দেখল মাথায় সোয়েটার গলাচ্ছে সুরভি। বালিশ সরিয়ে নিয়ে জানালাটা পুরোপুরি তুলে দিল ও। মাথা বের করে দিয়ে দেখল লেকের কিনারা আধ মাইলটাক দূরে হবে। জোড়া রেললাইনের সংখ্যা দুটো থেকে ছ'টায় দাঁড়িয়েছে। সাইডিং-এর কিছু অংশ এক সারি বক্সকার দখল করে রেখেছে।

কাছেই করনাভিন স্টেশন, লাইনের শেষ মাথা। ফ্রেইট ইয়ার্ড পার হচ্ছে ট্রেন। এখনই কেটে পড়তে হবে ওদেরকে।

হোটেল লজ ইন্টারন্যাশনাল কোয়াই দ্য মন্ট ব্লাঙ্ক-এর শেষ মাথায়। তিন জায়গায় আলাদা তিনটে সিঙ্গেল রুম ভাড়া নিল রানা।

হোটেলের ডাইনিংরুমে ব্রেকফাস্ট আর কয়েকটা দৈনিক নিয়ে বসেছে রানা, শাওয়ার সেরে ওর টেবিলে এসে বসল সুরভি। বার্ন বা জেনেভা, দু'জায়গার কোন কাগজেই ড্রাগনার দুর্গের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছু লেখা হয়নি। এমন হতে পারে যে এগুলো রাতে ছাপা হবার পর পুলিশ ঘটনাটা মিডিয়াকে জানিয়েছে।

সুরভিকে তার রুমে পাঠিয়ে দিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে বেরুল রানা। এক ঘণ্টা পর নতুন একটা ব্রিফকেস নিয়ে হোটেলে ফিরল, তাতে দু'জনের জন্য এক সেট করে নতুন কাপড়চোপড়। নিজের জন্য কাপড়চোপড় ছাড়াও একটা রেনকোট কিনেছে রানা, ওগুলোর একটা পকেটে ভারী স্মাইসার পিস্তলটা রাখা যাবে, আরেকটায় জায়গা হবে নাইন এমএম কার্টিজের একটা বাক্সের।

রু দ্য লাউসানে অর্থাৎ সেন্ট পিটার্স হসপিটালে যেতে হলে ওদের হোটেল থেকে ট্যাক্সি ভাড়া একশো ফ্রাঙ্ক। ধবধবে সাদা পাঁচতলা ভবন, দেখে মনে হলো ব্যস্ত একটা জায়গা, লোকজন সবাই খুব দক্ষ। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এড়িয়ে কৌশলে কাজ হাসিল করতে তৎপর হলো সুরভি। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যখন জানতে পারল ওর নিহত বড় ভাই হের রেদোয়ান আহমেদের অ্যাকাউন্ট থেকে তামান্না মুবারকের চিকিৎসার খরচ দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হলো। ডাক্তার ভদ্রলোকের মেডিকেল স্মক-এ নাম লেখা রয়েছে—বাকনার। আকারে ছোটখাট একটা হাতি; লালচে-সোনালি ইঞ্চিখানেক

লম্বা দাড়ি আর চওড়া রিমের একটা চশমা মুখটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে।

রানাকে নেপথ্যে রেখে তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করল সুরভি। দু'জনের কারও মুখেই এক ফোঁটা হাসি নেই। কাঁধের উপর দিয়ে মাঝে মধ্যেই রানার দিকে তাকাচ্ছে সুরভি। আর ওদিকে ডাক্তারের চেহারা প্রতি মুহূর্তে আরও গম্ভীর হয়ে উঠছে। এক সময় ডাক্তারকে রেখে রানার কাছে ফিরে এল সুরভি। 'জানি না কীভাবে ব্যাখ্যা করব। মোটকথা আমরা যা ভেবেছিলাম তা নয়।'

'তামান্না মুবারক এই হসপিটালে আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আছে তো বটেই। কিন্তু তাকে তার কামরায় আটকে রাখা হয়েছে।'

'তোমার বড়দা সম্ভবত ওর নিরাপত্তার কথা ভেবেই সে ব্যবস্থা করে গেছেন।'

'না। শুধু নিরাপত্তার জন্যে নয়। তার চিকিৎসাও দরকার।'

'মানে? কী চিকিৎসা?'

'কী চিকিৎসা বা কী অসুখ তা নাকি ব্যাখ্যা করা একটু জটিল,' বলল সুরভি। 'ডাক্তার বাকনার বলছেন আমাদের একবার চারতলায় উঠে দেখা দরকার। তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে।'

এলিভেটরে চড়ে উপরে উঠবার সময় রানা বলল, 'রোগটা কঠিন হলে সারতে সময় লাগবে, ততদিন ওকে নিয়ে আমরা ব্যাংকেও যেতে পারব না।'

কিন্তু চারতলায় উঠে দেখা গেল পরিস্থিতি তারচেয়েও খারাপ। নিজের কেবিনে হুইলচেয়ারে বসে রয়েছে তামান্না মুবারক, দরজার দিকে পিছন ফিরে। মোটাসোটা নার্স, ব্যাজে নাম লেখা রয়েছে মার্থা, করিডর থেকে সে-ই ওদেরকে পথ দেখিয়ে ভিতরে এনেছে, হুইলচেয়ারটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'তামান্না, দেখো, ওঁরা তোমাকে দেখতে এসেছেন।'

রীতিমত একটা ধাক্কা খেল রানা। বিশ-বাইশ বছরের শীর্ণ একটা মেয়ে, চোখ দুটো গর্তে ঢোকা, দৃষ্টিতে এতটুকু সজীবতা নেই। কোলের উপর পড়ে থাকা হাত দুটো নিজে থেকেই কাঁপছে।

রানার কানের কাছে ফিসফিস করল সুরভি, 'আমার কোন ধারণাই ছিল না–'

নার্স মার্থা এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল, 'তামান্না মুবারককে এক বাঙালী ভদ্রলোক এখানে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন। ও ইরাকি মেয়ে। দেশে থাকতে চোখের সামনে ওর হবু স্বামীকে আমেরিকান সৈন্যরা বেয়োনেট চার্জ করে মেরে ফেলে। সেই থেকে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার সে। প্রথমে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখত, ধীরে ধীরে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। এ এমন কোন কঠিন অসুখ নয় যে সারবে না, তবে দীর্ঘদিন ভাল চিকিৎসা দরকার হবে। সবচেয়ে বেশি দরকার আপনজনদের আদর আর ভালবাসা। সত্যি কথা বলতে কী, চিঠিটা ফিরে না এলে অসুখটা এত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যেত না...'

'চিঠি?' জানতে চাইল সুরভি।

রানা যেন অথৈ সাগরে পড়ে গেছে। নিজেকে গুটিয়ে রাখা মানুষ নামের এই

শামুক ওর কোন কাজে আসবে না। মেয়েটার এই অবস্থার জন্য মনটা যতই করুণ রসে সিক্ত হোক, ওকে দেশের সম্মান আর নিজের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে। ওই কাঁপা হাত দিয়ে তামান্না কোনও কাজই করতে পারে না, সে একটা কার্ডে স্পষ্ট অক্ষরে সই করবে কীভাবে?

মুবারক ফর্মুলা কি তাহলে কোন একটা ব্যাংকের ভল্টে রাখা সেফ ডিপোজিট বক্সের ভিতর চিরকালের জন্য তালা দেওয়া অবস্থায় পড়ে থাকবে।

প্রশ্নটা বোধহয় শুনতে পায়নি মার্থা, তাই আবার তাকে জিজ্ঞেস করল সুরভি। 'আপনি একটা চিঠির কথা বললেন। কার চিঠি?'

'তামান্নারই লেখা চিঠি। বাবাকে লিখেছিল। আমিই তাকে এনভেলাপ কিনে এনে দিই। অসুখটা তখন এতটা খারাপের দিকে যায়নি। আমার সামনে কী সুন্দর করে ঠিকানা লিখল। কিন্তু চিঠিটা ডেলিভারি দেয়া সম্ভব হয়নি। ফিরে আসে ওটা।'

'ফিরে আসে কোথায়? হাসপাতালেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। কারণ রিটার্ন অ্যাড্রেস হিসেবে হাসপাতালের নামই লিখেছিল তামান্না।'

নরম সুরে রানা বলল, 'আমরা কি তামান্নার সঙ্গে দু'মিনিট একা থাকতে পারি?'

'হ্যাঁ, কেন নয়। ও খুব খুশি হবে।'

কেবিন থেকে মার্থা বেরিয়ে যেতেই তামান্নার বেডের পাশে দাঁড় করানো নাইট স্ট্যান্ডের দেরাজটা খুলে ফেলল রানা।

'মাসুদ ভাই, কী করছেন?' সুরভি স্তম্ভিত।

দেরাজের ভিতর থেকে একটা এনভেলাপ বের করল রানা। সেটার বাঁ দিকের কোণে স্পষ্ট অক্ষরে হসপিটালের ঠিকানা লেখা রয়েছে, তার উপরে রয়েছে তামান্না মুবারকের নাম।

সুরভিও লেখাটা দেখল। 'এটা দিয়ে কী হবে?'

'তামান্নার সইটা নকল করবে তুমি।' এনভেলাপটা জ্যাকেটের পকেটে ভরে সুরভির হাত ধরে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। এলিভেটরে চড়ে আবার বলল, 'আর মাত্র একটা সমস্যার সমাধান দরকার। আমাদের কাছে সেফ ডিপোজিট বক্সের একটা চাবি আছে। জানতে হবে কোন ব্যাংক এই চাবি ইস্যু করেছে।'

ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরবার সময় এনভেলাপটা খুলল রানা। চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। চোখ বুলিয়ে কোথাও কোন ব্যাংকের নাম খুঁজে পেল না।

চিঠি আর এনভেলাপ সুরভির হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঠিক কী করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে দিল রানা।

'ঠিক আছে, বুঝলাম,' ও থামতে বলল সুরভি। 'আর তুমি?'

'ব্যাঙ্কটা খুঁজে বের করব।'

'কীভাবে?'

'আগে খুঁজে তো পাই, তারপর ফিরে এসে তোমাকে জানাব কীভাবে পেলাম।'

বিকেল তিনটের দিকে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। এর আগে এক এক করে আরও পাঁচটা ব্যাংকে ঢু মেরেছে রানা। প্রতিটি ব্যাংকে একটা করে সেফ ডিপোজিট বক্স ভাড়া নিয়েছে। এখানেও, ব্যাংক জেনেভা-য়, পদ্ধতিটা রিপিট করছে ও। ওর আবেদন-পত্র হাতে নিয়ে এক তরুণী সেই একই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করছে, এর আগে পাঁচ জায়গায় পাঁচবার এসব শুনতে হয়েছে ওকে। আইডেনটিটি কার্ডে সই করবার সময় ঝুঁকে লক্ষ করল মেয়েটা রানার স্বাক্ষর।

'ভল্টে যখনই আপনি ঢুকতে চাইবেন, প্রতিবার এরকম একটা কার্ডে সই করবেন। ফাইলে যে সইটা রাখা হবে তার সঙ্গে পরের সইগুলো মেলানো হবে–এখন যে সইটা আপনি করছেন, এটার সঙ্গে। মাস্টার কী নিয়ে ব্যাংকের একজন কর্মচারী ভল্টে আপনার বক্সের কাছে যাবে। প্রতিটি সেফ ডিপোজিট বক্সে দুটো করে তালা আছে। আপনার চাবি একটা তালায় ফিট করবে, ব্যাংকের মাস্টার কী ফিট করবে অপরটায়। দুটো চাবি একই সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। এই নিন আপনার চাবি। বক্স PR-467।'

অবশেষে, সকাল থেকে যতগুলো চাবি সংগ্রহ করেছে রানা, সেগুলোর মধ্যে এটাই লেনার চাবির সঙ্গে মিলল। আকার-আকৃতি, চকচকে ইস্পাত, খোদাই করা হরফের ধাঁচ–সব হুবহু এক। মনে মনে উল্লসিত রানা। মেয়েটা ওর সিগনেচার কার্ড ফাইলে রাখছে, এই সুযোগে কাউন্টার থেকে খালি তিনটে কার্ড নিয়ে পকেটে ভরে ফেলল। আসল জিনিসের উপর বার কয়েক প্র্যাকটিস করবার সুযোগ পেলে ব্যাংকে এসে সই করতে একটুও কাঁপবে না সুরভির হাত।

হোটেলে ফিরে প্রথমে নিজের কামরাতেই ঢুকল রানা, টেবিলের উপর স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্কের ভল্ট-রিসিট পেপারওয়েট চাপা দিয়ে মুচকি হাসল। মোবারক ফর্মুলা কোন ব্যাঙ্কে আছে কেউ যদি জানতে চায় তো জানুক।

কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে নিজের ঘরে ডেস্কে বসে তামান্নার সই প্র্যাকটিস করছে সুরভি। কিন্তু গিয়ে দেখা গেল ঘরে সুরভি নেই। ডেস্কের সামনে এসে তার হাতের কাজ পরখ করল রানা। তামান্নার সই করা এনভেলাপ সামনেই পড়ে রয়েছে। পাশে ওকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটা চিরকুট: 'মাসুদ ভাই, আমার হাতে ব্যথা ধরে গেছে। এটার একটু বিশ্রাম দরকার। তাড়াতাড়িই ফিরব। সুরভি।'

ওয়েস্ট বাস্কেটে গোল পাকানো বেশ কিছু কাগজ পড়ে থাকতে দেখল রানা। উপর থেকে একটা তুলে সমান করে দেখল কেমন উন্নতি করেছে সে। বলতে হয় বেশ ভালই করছে। শেষ নমুনাগুলো নিখুঁত হয়তো নয়, তবে কাজ চালাবার মত। ব্যাংক জেনেভার সিগনেচার কার্ড তিনটে বের করে ডেস্কের ড্রয়ারে রাখল ও,

তারপর স্বাক্ষরের নমুনাগুলো টয়লেটে ফেলে ফ্লাশ করল। একটা চিরকুট লিখে বেরিয়ে এল কামরা থেকে। অনেকগুলো কাজ করতে হবে সুরভিকে, চিরকুটে তার একটা তালিকা পাবে সে। তালিকার শেষে লিখল: কাগজগুলো যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা উচিত হয়নি তোমার।

লাউঞ্জে যাবার পথে লবি থেকে একটা দৈনিকের সান্ধ্য সংস্করণ কিনল রানা। বার-এর টুলে বসে একটা ককটেল চাইল, কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছে। লেনার ক্ষতবিক্ষত নগ্ন লাশের ছবিটা ছাপা হয়েছে দেখে অসুস্থ বোধ করল রানা। বলা হয়েছে, এখনও কোন লাশের পরিচয় জানা যায়নি। যে দু'জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক মারা গেছেন। অপর লোকটাকে পরীক্ষা করে একজন ডাক্তার জানিয়েছিলেন, প্রচুর সেডাটিভ গ্রহণ করায় চৈতন্য হারিয়েছে; কিন্তু রাতে জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাউকে কিছু না বলে হাসপাতাল থেকে চলে গেছে সে।

ককটেল আসতে দু'ঢোকে গিলে ফেলল রানা। থান্ডার পালিয়েছে! কোন সন্দেহ নেই, এদিকেই আসছে সে।

খবরটার বাকি অংশটুকুও পড়ল রানা। রিপোর্টাররা একটা গুজব সম্পর্কে জানতে চাইলে ক্লস্টার্স পুলিশ কোন মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। গুজবটা হলো, রেন্ট-আ-কার কোম্পানির একটা ইংলিশ-মেইড গাড়ি ফেলে রেখে ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী একলোক নাকি নিখোঁজ হয়ে গেছে।

একটু পর সুরভি আসতে কী ঘটেছে ব্যাখ্যা করল রানা। শুনে তেমন উদ্বিগ্ন হলো না সুরভি। বলল, 'সইটা আমি এখনই নকল করতে পারব। ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে, তা না হলে আজই কাজটা সারতে পারতাম। মাঝখানে শুধু একটা রাতই তো। ইনশাল্লাহ, কোন বিপদ হবে না।'

কিন্তু রানা ব্যাপারটাকে এত সহজভাবে নিতে পারছে না। ও জানে, ওর যে সময় লেগেছে, জেনেভা-য় পৌঁছাতে তারচেয়ে একটুও বেশি সময় নেবে না থান্ডার। কাল সকালের মধ্যে সে হয়তো ওর ঘাড়ের পিছনে নিঃশ্বাস ফেলবে।

তবে এসব কথা বলে সুরভিকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না।

হোটেলের পে বুদ থেকে রানা এজেন্সির জেনেভা শাখার সেকেন্ড-ইন-চার্জ মুশফিক মনসুরকে ফোন করতে চলে গেল সুরভি। ফিরে এসে রানাকে বলল, 'মুশফিক বলছে, কাল সকালের আগে কাজ শেষ করা যাবে না।'

পরদিন ভোরে ভাড়া করা তৃতীয় কামরাটি থেকে বেরিয়ে এল রানা। চলেছে ওর মালপত্র যে-ঘরে আছে সেই দিকে।

ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল রানা, কোথায় যেন কী ঠিক নেই। খুশি হয়ে উঠল ও। দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস নিল ও। ক্ষীণ, তবে এ তামাকের গন্ধ ওর চেনা। থান্ডার! বিশেষ ব্র্যান্ডের চুরুট তার উপস্থিতির প্রমাণ রেখে গেছে।

ডেস্কের সামনে এসে রানা দেখল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক থেকে নিয়ে আসা ভল্ট-রিসিটটা নেই। এর মানে হলো, থান্ডার ধরে নেবে এই ব্যাংক থেকেই রানা মুবারক ফর্মুলা উদ্ধার করবে।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। ইতোমধ্যে টেলিফোন করে ঘুম ভাঙিয়েছে সুরভির। সে-ও নিজের ঘরে তৈরি হচ্ছে। খুলবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক জেনেভা-য় ঢুকতে চায় ওরা।

ব্রেকফাস্টে বসে কী ঘটেছে সুরভিকে জানাল রানা।

চমকে গেল সুরভি। 'তাহলে? এখন কী হবে?'

'কিছুই হবে না। ও অন্য ব্যাঙ্কে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।' এবার গত রাতে টেবিলের উপর ভল্ট-রিসিট রাখবার কথাটা সুরভিকে জানাল ও।

আশ্বস্ত হল সুরভি।

'থান্ডার তোমাকে কখনও দেখেনি,' ওকে বলল রানা। 'তাই আমরা ব্যাংকে এক সঙ্গে যাব না, আলাদা ভাবে যাব। তাহলে দু'জনের যোগাযোগটা সে টের পাবে না।'

হঠাৎ সুরভির খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। 'মাসুদ ভাই, ব্যাংকের ক্লার্ক যদি ধরে ফেলে আমি তামান্না নই, তখন কী হবে?'

'হ্যাঁ, তোমাকে নকল মানুষ হিসেবে চ্যালেঞ্জ করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভালমানুষ সেজে তর্ক চালিয়ে যাবে তুমি। তারপর আমি হাজির হয়ে কনফিউশন আরও বাড়িয়ে দেব। মানে, একটা গোলমাল পাকিয়ে দিয়ে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করব।'

ব্রেকফাস্ট দু'জনের কারও গলা দিয়েই নামতে চাইছে না। প্রায় কিছু না খেয়ে সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এল ওরা। হোটেলের ডোরম্যান হাত তুলে দুটো ট্যাক্সি ডাকল। প্রথমটায় রানা উঠল। ওদের লাগেজ নিয়ে দ্বিতীয়টায় উঠল সুরভি।

ব্যাংক খুলবার কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তার ওপারে পৌঁছাল রানার ট্যাক্সি। রাস্তা পেরুতে ইচ্ছে করে বেশি সময় নিচ্ছে ও। চারদিকে চোখ বুলিয়ে অস্বাভাবিক কিছু দেখল না। অবশ্য থান্ডার যদি এসে থাকে, তাকে খুঁজে বের করবার দায়িত্ব সুরভির। সে রানার পিছন দিকটায় নজর রাখছে।

ব্যাংক বিল্ডিংটা গ্র্যানিট পাথরের তৈরি। সামনের দিক পুরোটাই কাঁচ দিয়ে মোড়া। একজোড়া প্লেট গ্লাস ডোর দিয়ে ঢুকতে বা বেরুতে হয়। প্রতিটি দরজা নিউম্যাটিক সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত, ফলে কাস্টমার রাবার-ম্যাট মোড়া ট্রেডল প্লেটে পা রাখলে ওটা আপনাআপনি খুলে যায়। বাইরে থেকে আলোকিত পুরো লবিটা দেখা যাচ্ছে।

দরজার ঠিক ভিতরে একজন সিকিউরিটি গার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। মধ্যবয়স্ক লোকটার মুখে অনেক ভাঁজ পড়েছে, তবে চোখ দুটো সদা সতর্ক। ওকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ দেখল লোকটা। ভারী পকেট সহ

রেনকোট গায়ে কাল বিকেলে দেখেছে, সেটাই হয়তো কারণ–চিনে ফেলেছে।

লবির পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরিয়ে একটা কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছে রানা। ভল্টে যেতে হলে ওই কাউন্টারের বাধা পেরুতে হবে। ভল্ট ওটার পিছন দিকটায়। রানা হাঁটছে, ওর একপাশে ক্লার্কদের ছোট ছোট খোপ, আরেক পাশে রেইলিঙের ভিতর অফিসারদের ডেস্ক।

সেই তরুণী রানাকে দেখেই চিনে ফেলল। 'গুড মর্নিং, মিস্টার রানা,' বলে হাসিমুখে একটা সিগনেচার কার্ড ঠেলে দিল।

ফাইলে রাখা ওর মাস্টার কার্ড খুঁজছে সে, ঘাড় ফিরিয়ে সুরভি পৌঁছেছে কি না দেখল রানা। লক্ষ করল, গার্ড এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তার পিছনে, কাঁচের বাইরে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকে ঢুকবার জন্য ফুটপাথ পেরোচ্ছে সুরভি। অটোমেটিক দরজা হিসহিস করে উঠতে রানার উপর থেকে চোখ সরিয়ে ঘুরে গেল গার্ড, সুরভিকে ভিতরে ঢুকতে দেখছে।

'আপনাকে এখন আমি ভল্টে নিয়ে যাব, মিস্টার রানা।' সদ্য সই করা কার্ডটা রানার বাড়ানো হাত থেকে নিয়ে হাসল মেয়েটা, তারপর কাউন্টারের শেষ মাথায় সরে এসে ভল্ট ডোরের কাছাকাছি কোমর সমান উঁচু একটা ছোট গেট খুলল।

গেটের ভিতর ঢুকে অপেক্ষা করছে রানা, তামার খাড়া রড দিয়ে তৈরি আরেকটা দরজা খুলছে মেয়েটা। নিরাপদ কামরাটায় পৌঁছানোর এটাই শেষ বাধা। পথ দেখিয়ে ওকে একটা পাঁচিলের কাছে নিয়ে এল মেয়েটা। পাঁচিলটা চকচকে ইস্পাতের ছোট ছোট বক্স দিয়ে তৈরি। প্রতিটি বক্সের দরজায় দুটো করে কী হোল। রানার ভাড়া করা বক্সের দরজা খুলবার জন্য দুটো চাবি এক সঙ্গে কী হোলে ঢুকিয়ে ঘোরাল সে। তারপর ঘুরে চলে যাবার সময় ইঙ্গিতে কল বাটনটা দেখিয়ে দিল, কাজ শেষ হলে ব্যবহার করতে হবে।

রানা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, ইতোমধ্যে কাউন্টারে পৌঁছানো সুরভিকে যাতে দেখতে পায়। সে যদি নার্ভাস হয়েও থাকে, ভল্ট অ্যাটেনড্যান্টের কাছ থেকে সিগনেচার কার্ড নেওয়ার সময় ভালভাবেই গোপন করে রাখতে পারল সেটা। তার সদ্য করা সই তামান্না মুবারকের আসল সই-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

পরীক্ষায় সুরভি পাস করেছে দেখে রানার পেশীতে ঢিল পড়ল। দরজার কাছ থেকে সরে এল ও, নিজের খালি বক্সটা কোমর সমান উঁচু একটা ওঅর্ক শেলফে রাখল।

সুরভি আর ক্লার্ক নিজেদের চাবি দিয়ে তালা খুলছে, সেদিকে পিঠ দিয়ে নিজের জায়গায় অপেক্ষা করছে রানা। লম্বা কালো বক্সটা নিয়ে রানার কাছে চলে এল সুরভি। রানা ওটার ঢাকনি তুলছে, সুরভি দম বন্ধ করল। ঢাকনিটা হঠাৎ নামিয়ে রাখল ও। 'বাইরে কী দেখেছ বলো,' নিচু গলায় জানতে চাইল।

'সে সম্ভবত পৌঁছে গেছে, মাসুদ ভাই। তুমি যখন ব্যাংকে ঢুকছ, রাস্তার

ওপারের একটা দরজার আড়াল থেকে বেরুল। বেশ লম্বা। মুখে চুরুট। পার্ক করা একটা গাড়ির পাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল। এ-লোক থান্ডার না হয়ে যায় না। মনে হলো একাই।'

'তার মানে আমার সব চালাকি পানিতে গেছে,' বলল রানা। 'প্রথমে দেখি এসো বক্সটা থেকে আমরা কী পেলাম।' ঢাকনিটা তুলল ও। একটা বিজনেস-সাইজ এনভেলাপ রয়েছে ভিতরে। জিনিসটা চ্যাপ্টা, মুখটা খোলা। ভিতর থেকে বেরুল তিন প্রস্থ বন্ড পেপার। ডক্টর দানিশের হস্তাক্ষর শেষদিকে একটু আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে, তবে যা থাকবার কথা তার সবটাই আছে—তাঁর আবিষ্কৃত মহা বিস্ময়কর পদার্থ তৈরি করবার সাত ভাগে ভাগ করা সাতটা ফর্মুলা।

ফর্মুলাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় অ্যাপারেটাস আর টেমপারেচার সম্পর্কে টেকনিক্যাল ডিটেলস্, রিয়্যাকশন ইত্যাদি।

'ব্যস; এই-ই সব?' সুরভিকে হতাশ মনে হলো।

'অনেক সময় ছোট প্যাকেটের ভেতর বড় জিনিস লুকিয়ে থাকে,' মনে করিয়ে দিল রানা।

থান্ডারের মোকাবিলা করবার আগে আরেকটা কাজ বাকি আছে রানার। 'এখানে দাঁড়িয়ে ব্যস্ততার ভান করো,' সুরভিকে বলল ও। 'আমার এক মিনিটও লাগবে না।'

ব্যাংকের ফটোস্ট্যাট মেশিনটা একজন কমপিউটার অপারেটরের ডেস্কে। তাকে আড়াল করে কাগজ তিনটে কপি করল রানা। কাজটা করবার সময় আবার নিজের গায়ে ব্যাংক গার্ডের দৃষ্টি অনুভব করল ও। ওর উপর লোকটার আগ্রহ খুবই অস্বস্তিকর।

ভল্টে আবার ঢুকবার সময় আরও একটা আইডেনটিটি কার্ড সই করবার ঝামেলা থেকে রেহাই দেওয়া হলো ওকে। 'ধরো, একটা ইন্সুরেন্স করে রাখলাম,' সুরভিকে বলল ও। 'যদি কখনও ডুপ্লিকেট দরকার হয়। তুমি কিন্তু সত্যি দারুণ দেখিয়েছ। তোমার সাহায্য ছাড়া এত দূর আমি আসতে পারতাম না।'

'যেটা তুমি মুখ ফুটে বলতে পারছ না—প্রয়োজন হলে এখানে এসে আবার পরীক্ষাটা দিতে হবে আমাকে! ওহ্, মাসুদ ভাই, কী ভয় যে...'

'কোন ভয় নেই,' বলে সুরভিকে আশ্বস্ত করলেও, রানা নিজে কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ও জানে, থান্ডারের মুখোমুখি হবার বিপদটা এড়াবার কোন উপায় নেই। বিপদটা একা ওর বা সুরভির নয়, আশপাশে সেই মুহূর্তে নিরীহ যে-সব মানুষ থাকবে তাদের সবার।

রানার গম্ভীর চেহারা লক্ষ করল সুরভি। 'মাসুদ ভাই, তুমি কি ভাবছ আমি কোন সাহায্যে আসব না?'

'না, তা কেন ভাবব। তোমার সাহায্য তো আমাকে নিতেই হবে।' ডক্টর দানিশের এনভেলাপটা সুরভির হাতে গুঁজে দিল রানা। 'এটা নিয়ে ব্যাংক ছেড়ে বেরিয়ে যাও। সোজা নিজের ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠবে। তারপর কোথায় যেতে হবে,

কী করতে হবে, সব তুমি জানো। আমি থান্ডারকে এদিকে ব্যস্ত রাখব। যাবার সময় থামবে না বা পিছন ফিরে তাকাবে না।'

'দুঃখিত, মাসুদ ভাই, এতে কাজ হবে না,' ম্লান সুরে বলল সুরভি। 'তোমাকে একটা কথা বলবার সুযোগ পাইনি। যে লোকটাকে আমার থান্ডার বলে সন্দেহ হয়েছে তাকে আমি আমার ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে দেখেছি। ড্রাইভার জানে আমরা হোটেল থেকে একই সঙ্গে বেরিয়েছি। সে তোমার ট্যাক্সিকে অনুসরণ করে ব্যাংকে পৌঁছেছে। থান্ডারও এতোক্ষণে নিশ্চয় জানে যে আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

সুরভির কথায় যুক্তি আছে। নিজেদেরকে আলাদা ধরে নেওয়াটা ভুল হবে। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে একজনকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে হলে দু'জনের চেষ্টা দরকার হবে।

'আমার পিছনে থাকাও চলে না,' আবার বলল সুরভি। 'ব্যাঙ্কের সামনে যদি খারাপ কিছু ঘটে, দরজার পাশের সিকিউরিটি গার্ড সবাইকে ভেতরে আটকে দেবে। পরে আমাকে জেরা করা হবে, জানা যাবে আসল পরিচয় গোপন করে অসৎ উদ্দেশে এখানে এসেছিলাম আমি। মুবারক ফর্মুলা এই দালান থেকে বের করতে চাইলে আমাকে সামনেই থাকতে হবে।' কালো লম্বা বক্সটা ভল্ট ওয়ালে ঢুকিয়ে রাখল সে, ছোট ইস্পাতের দরজা বন্ধ করে দিল।

রানাও ওর খালি বক্সটা জায়গা মত ভরে রাখল। 'দাঁড়াও,' ফিসফিস করল ও। 'এক মিনিট চিন্তা করতে দাও আমাকে।'

রানার আসলে আরও বেশি সময় দরকার। একটা আইডিয়ার জীবাণু মাত্র বংশবিস্তার শুরু করেছে।

ঝুঁকি আছে। আর সব কিছু নির্ভর করবে টাইমিং-এর উপর।

প্ল্যানটা ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করছে রানা, জবাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সুরভি। সবশেষে রানা জিজ্ঞেস করল: 'রেডি?' আবার মাথা ঝাঁকাল সুরভি। বোতামে চাপ দিয়ে ভল্ট অ্যাটেনড্যান্টকে ডাকল রানা। ওরা একসঙ্গে বেরুল, তবে পার্স হাতড়াবার ভান করে একটু পিছনে রয়ে গেল সুরভি। রানা জানে, ওর পিঠে একটা চোখ রেখেছে সে।

লবি ধরে হেঁটে এসে ঠিক রাবার ম্যাট-এর সামনে থামল রানা। এটাই অটোমেটিক ডোর ওপেনারকে অ্যাকটিভেট করবে। ওখানে একমুহূর্ত থেমে জোড়া ফুটপাথে পার্ক করা দু'সারি অটোমোবাইলের উপর চোখ বুলাল ও। ওদিকেই কোথাও আছে থান্ডার। উজ্জ্বল লবিতে নিশ্চয়ই ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। রানাকে দেখতে হচ্ছে পুরোটা রাস্তা, আর তাকে মাত্র একটা দরজা।

চোখের কোণে বাঁ দিকে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। পার্ক করা একটা গাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে এল আরবিটার। এত দূর থেকেও তার চোখ ঠাণ্ডা আর অপলক লাগল রানার।

থান্ডারকে দেখামাত্র রেইন কোটের বাম পকেট থেকে হাত বের করল রানা—সুরভির জন্য এটা একটা সংকেত। ও জানে, লবি ধরে ওর দিকে হেঁটে

আসছে সুরভি।

থান্ডারের উপর থেকে চোখ সরায়নি। প্রায় সাবলীল আর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জ্যাকেটের ভিতর হাত গলিয়ে ভারী একটা অটোমেটিক পিস্তল বের করল থাণ্ডার। ত্রিশ ফুট দূর থেকে ওটাকে ছোটখাট একটা কামান বলে মনে হলো। সক্ষ্ম কোন কৌশল খাটাবার কথা ভাবছে না থান্ডার, গোপনীয়তার ধারও ধারে না। তার চোখের বুনোদৃষ্টিতে একটাই মেসেজ: খুন করব!

এখন থেকে দু'মিনিট পর রানা আর থান্ডারের মধ্যে মাত্র একজন বেঁচে থাকবে।

রেইন কোটের পকেটে হাত ভরে স্মাইসার পিস্তলের গ্রিপটা মুঠোয় ভরল রানা। সুরভি ওর পাশে চলে এল। তার কোমরটা বামহাতে জড়াল ও। সুরভিও এই সময় চিৎকার দিল: 'ডাকাতি হচ্ছে!'

তাকে জড়িয়ে ধরে খানিকটা ঘোরাল রানা, নিজের আর গার্ডের মাঝখানে সুরভি যাতে একটা ঢাল হিসাবে থাকে। 'কেউ নড়বে না!' গর্জে উঠল ও। 'যে যেখানে আছ সেখানেই থাকো!'

হোলস্টারে ভরা পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল গার্ড। কিন্তু রেনকোটের পকেটে স্মাইসারের আকৃতি ফুটে আছে দেখে হাতটা নামিয়ে নিল সে।

পিছু হটে ডোর ট্রেডেলে পা রাখল রানা, সুরভিকে ছাড়েনি। ওর টাইমিং সেকেন্ডের কাঁটা ধরে সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। ব্যাঙ্কের অ্যালার্ম বেজে উঠল ঠিক যখন নিউম্যাটিক দরজা খুলল। রানা যেমন প্রত্যাশা করেছিল, সতর্ক একজন ব্যাংক কর্মচারী পরিস্থিতি অনুসারে রিয়্যাক্ট করেছে। ও আশা করল, গার্ড লোকটাও বিপজ্জনক মুহূর্তে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের দায়িত্ব পালন করবে। তা যদি করে, তাহলে রানার নয়—তার অস্ত্রই থান্ডারকে ফেলে দেবে।

অ্যালার্ম চমকে দিল থান্ডারকে। তাতে সেকেন্ডের যে ভগ্নাংশ দরকার ছিল রানার, পেয়ে গেল সেটা। সুরভিকে এক পাশে ঠেলে দিল ও। হোঁচট খেয়ে তিন-চার পা এগোল সে, তারপর ছিটকে সরে গেল পথ থেকে দূরে। রানা ছুটল উল্টোদিকে, তারপর ডাইভ দিল একটা কুলঙ্গি লক্ষ্য করে।

স্মাইসার রানার পকেট থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে, এই সময় থান্ডারের প্রথম গুলি ছুটে এল। রানার পাশে দরজার পুরু কাঁচ মাকড়সার জাল হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা হলো ব্যাংকের ভিতর থেকে। গার্ড যখন দেখল থান্ডার তার দিকে রিভলভার তুলে গুলি করতে যাচ্ছে, স্বভাবতই তাকে ব্যাংক ডাকাতি করতে আসা রানার সহযোগী বলে মনে করল সে। ধরে নিল রানাকে পালাবার সুযোগ করে দেওয়াটাই থান্ডারের উদ্দেশ্য। গার্ডের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। রানারটা নয়।

নাইনএমএম সীসা থান্ডারের কাঁধ থেকে খাবলা মেরে পোয়াটাক মাংস তুলে নিয়ে গেল। পিছু হটল থান্ডার, কুঁজো হলো, কিন্তু তারপর আবার দুটো গাড়ির মাঝখানে সিধে হলো। তার হাত থেকে কালো অস্ত্রটা পড়ে গেল। আরও এক পা পিছু হটল সে। তারপর যখন ঝুঁকে পিস্তলটা তুলতে যাবে, আরেকটা গুলি করে

তার ডান হাঁটু গুঁড়িয়ে দিল রানা।

একদিকে খাটো হয়ে গেল থান্ডার, তারপর পিছনে কাত হয়ে আছাড় খেল ফুটপাথ থেকে খোলা রাস্তায়। এয়ার ব্রেকের হিস্‌হিস্‌ আর কংক্রিটের সঙ্গে গা রিরি করা টায়ারের ঘর্ষণ শুনতে পেল রানা। প্রকাণ্ড একটা ট্যুরিস্ট বাস স্থির দেহটাকে এড়াবার জন্য একদিকে কাত হয়ে গেল। এমন হঠাৎ রাস্তায় পড়েছে থান্ডার যে থামবার কোন উপায় নেই ড্রাইভারের। রানা সামনের দিকে ছুটল। একটা গাড়ির আড়াল পেয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। সুরভি রয়েছে ওর কাছ থেকে চারগাড়ি দূরে, ফুটপাথ ধরে খটখট শব্দে অপেক্ষারত ট্যাক্সির দিকে হাঁটছে। রানার পিছনে ব্যাংক গার্ড খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটা হাঁ হয়ে গেছে। চেহারায় হতচকিত ভাব।

রানার কাছ থেকে দশ ফুট দূরে পড়ে রয়েছে থান্ডার, যেন লাল ক্যানভাসের মাঝখানে কিম্ভূতকিমাকার একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট। বাসের চওড়া সামনের চাকা তার বাঁ পা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। গুরুতর আহত পোকার মত অসহ্য ধীরগতিতে নড়ছিল, দ্বিতীয় ডবল-চাকা তার শরীরের উপর উঠে নাড়িভুঁড়ি প্রায় সবই বের করে দিয়েছে। রানার চোখের সামনে স্থির হয়ে গেল থান্ডার।

বীভৎস দৃশ্যটার চারপাশে ভিড় করেছে লোকজন। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে রানা দেখল সুরভি ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে। পিছনের দরজাটা খুলে দিল সে।

কোইনট্রিন এয়ারপোর্টে যাবার পথে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদ দেখে ড্রাইভারকে একবার থামতে বলল সুরভি। রানা এজেন্সির জেনেভা ব্রাঞ্চের সেকেন্ড-ইন-চার্জ মুশফিক মনসুরের সঙ্গে তিন মিনিট কথা বলল সে। বুদ থেকে ট্যাক্সিতে ফিরে এসে রানাকে জানাল: 'সব ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। তোমার কথা মতই সব করা হয়েছে।'

'আমি ডিটেইলস্‌ শুনতে চাই, প্লিজ।'

'হসপিটাল থেকে একটা হেলিকপ্টারে তুলে জেনেভায় নিয়ে আসা হয়েছে তামান্নাকে,' বলল সুরভি। 'এই মুহূর্তে একটা চার্টার করা প্লেনে রয়েছে সে। প্লেনটাকে আসলে হসপিটালও বলা যায়—একজন ডাক্তার আর একজন নার্স আছে। আরেকজন নামকরা ডাক্তার ও নার্স খানিক পর তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।'

'ভেরি গুড। আর?'

'তোমার আর আমার নতুন পাসপোর্ট নিয়ে এজেন্সির একজন এজেন্ট এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে। তোমার নাম ডক্টর অতিথি হায়দার, আমার নাম সিসটার শ্রাবণী সাজিদ। তামান্না মুবারকের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে রানা এজেন্সির সিঙ্গাপুর শাখা। উড়ন্ত হাসপাতালে আমরা তার দেখাশোনা করব।'

'আমরাই তাহলে সেই নামকরা ডাক্তার ও নার্স?'

'নিশ্চয়ই। আমাদের পরিচয় তো আর মিথ্যে নয়!'

'ভাবছি, উড়ন্ত হাসপাতালের একটা জানালা খুলে রাখলে কেমন হয়,' গম্ভীর

গলায় বলল রানা।

'কেন?' অবাক হয়ে গেল সুরভি।

'তা হলে হু-হু করে ঠাণ্ডা ঢুকত ভেতরে,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা বাধ্য হতাম কম্বলের নীচে গিয়ে ঢুকতে।'

লাল হয়ে উঠল সুরভির ফর্সা মুখটা।

হাত মুঠো করে কিল দেখাল।